ইউরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়,
সিটি কলেজের বাণিজ্য ও সাধারণ বিভাগের অর্থবিদ্যা
ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক।

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও স্কটিশচার্চ কলেজের অর্থবিদ্যা ও
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক মহাশয়ের ভূমিকা
সম্বলিত।

ভারত সাহিত্য ভবন
২০৩।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য
ভারত সাহিত্য ভবন
২০৩।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম মুদ্রণ
মূল্য—২৲ টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা।

অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে-

লেখকের কথা

এম, এ পরীক্ষা দিয়ে ব'সে আছি। হাতে কোন কাজ নেই। খেয়াল হ'লো যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা নিয়ে একখানা বই লিখব। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে মনের ইচ্ছা জানালাম। তিনি সানন্দে সকল প্রকার সাহায্য ক'রতে স্বীকৃত হ'লেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অকুণ্ঠ সাহায্যের জন্য আমি তাঁর কাছে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞতা আমার ভারত সাহিত্য ভবনের কর্ণধার শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকটও অসীম। তিনি এইরূপ পরীক্ষামূলক প্রকাশনের বাণিজ্যিক সফলতার সম্ভাবনার দিকটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে নিজের উদারনীতির পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীন ও সাম্প্রতিক যুগ দুই খণ্ডে বইখানি প্রকাশিত হবে। তবে প্রত্যেক খণ্ডকেই স্বতন্ত্র হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভূমিকায় অনেকে হয়ত সমুদ্রের আভাষ পাবেন; কিন্তু পরে দেখবেন যে সামান্য খাল মাত্র। সুতরাং আমি সতর্ক করে দিতে চাই। রাষ্ট্রনীতি চিন্তাকে আমি মাঝে মাঝে ছুঁয়ে গেছি মাত্র। সম্পূর্ণ ভাবে পরিচিত করবার সাহস ও প্রচেষ্টার কোন পরিচয়ই এই বইএ পাবেন না।

বইখানিতে কিছু ভুল র'য়ে গেল। শ্রেণীবিভাগে ভুলগুলি এইরকম দাঁড়ায়: নামের উচ্চারণ; প্রুফ দেখায় দোষ; ব্যাকরণ উপেক্ষা ক'রে ইংরেজী ও বাংলা নূতন শব্দ সৃষ্টির প্রয়াস; বাংলা হরফে গ্রীক, রোমান ও ইংরেজী শব্দের রূপদানের প্রচেষ্টা। সকল শ্রেণীর ভুলই অমার্জনীয় অপরাধের তকমা পরে দাঁড়িয়ে আছে। অপরাধ যখন অমার্জনীয় তখন মিষ্ট বাক্যে সমালোচকের মন ভেজাবার চেষ্টা অপব্যয় মাত্র। অপব্যয়ে মন সরলো না, তাই এখানেই আমার কথা শেষ করলাম:—

ইতি

শ. ল. সু.

সিটি কলেজ

১লা মে, ১৯৫০

ভূমিকা

ব্যাপকভাবে মানব-সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মানুষ ধীরে ধীরে অন্ধবিশ্বাসের পথ ছাড়িয়া ক্রমে বুদ্ধি ও যুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছে। মানুষের ইতিহাসকে বুদ্ধিবৃত্তির বিবর্ত্তনের ইতিহাস বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগদ্বারা মানুষ নিজ জীবনযাত্রাকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে; নিজ পরিবেশকে ইচ্ছামত যথাসম্ভব পরিবর্ত্তিত করিয়া মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিয়াছে। মানুষের ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘবদ্ধ জীবনে এই ধারা অল্পবিস্তর সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে পরিলক্ষিত হয়।

রাষ্ট্র মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের একটি প্রকাশ। যে সকল প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ ও ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতিবিধান করিয়াছে তাহার ভিতর রাষ্ট্রই সর্ব্বপ্রধান। রাষ্ট্র যে শুধু সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছে তাহা নহে, রাষ্ট্র মানুষের নৈতিক, মানসিক ও আর্থিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত আবশ্যক ও শক্তি-অনুযায়ী নানা প্রচেষ্টায় লিপ্ত হইয়াছে। শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিয়ামকরূপে অগ্রসর হইয়াছে। তাই সর্ব্বদেশে রাষ্ট্রশক্তি বিপুলভাবে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই প্রভাবের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব এত বেশি যে তাহার পরিমাপ করা অসম্ভব। জীবনযাত্রার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিরাট অবদান আছে বলিয়াই চিন্তানায়কেরা রাষ্ট্রের রূপ, গঠন, প্রকৃতি ও আদর্শ সম্বন্ধে নিজ নিজ চিন্তার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে আরও দেখা যায় যে বিভিন্ন কালের রাষ্ট্রচিন্তার উপর তৎকালীন যুগধর্ম্ম আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বিভিন্ন যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ রাষ্ট্রদর্শনের উপর প্রতিফলিত হইয়াছে। তাই কোন যুগের রাষ্ট্রচিন্তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে সেই যুগের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক ইতিহাসের সহিত পরিচয় স্থাপন প্রয়োজন হইয়া পড়ে। প্লেটোর মহান আদর্শ বুঝিতে হইলে গ্রীসের খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর রাষ্ট্রিক, অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ ধারণা অপরিহার্য্য। রুশোর রাজনৈতিক মতবাদ ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী পটভূমিকায় স্পষ্ট হইয়া ওঠে। রাষ্ট্রিক আদর্শ ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক প্রভাবগুলির ফলস্বরূপ। অন্যপক্ষে, যে সকল রাষ্ট্রাদর্শ জনসাধারণের মনের উপর ব্যাপকভাবে ক্ষমতাবিস্তার করে তাহা সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থাকে মৌলিকভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হয়। রুশোর ভাবধারা ফরাসীদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর যে অখণ্ড প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহারই ফলে ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছিল। মার্কসীয় দর্শন নিষ্পেষিত জনসাধারণের মানসলোকে যে আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছে, তাহারই জন্য বৈপ্লবিক সমাজবাদ আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

রাষ্ট্রিক আদর্শ বিভিন্নকালে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে। অনেক সময় রাষ্ট্রচিন্তা প্রতিক্রিয়াকে সাহায্য করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এক শ্রেণীর রাষ্ট্রবিদেরা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন যে রাজন্যবর্গের স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থার পশ্চাতে বিধিদত্ত অধিকার আছে। রাজার সকল আদেশ নির্ব্বিচারে পালন করাই প্রজাগণের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য। নৃপতির আদেশ লঙ্ঘন করা ও ভগবানের বিরোধিতা করা একই বস্তু। বলা বাহুল্য

এই নীতি প্রতিক্রিয়াশীল রাজন্যবর্গকে স্বৈরাচারে সহায়তা করিয়াছে। আর একশ্রেণীর রাষ্ট্রচিন্তাকে সমালোচনামূলক রাষ্ট্রচিন্তা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এইরূপ চিন্তাধারা পুরাতন ও প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনের প্রতিকূল। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তন এই শ্রেণীর চিন্তাধারার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই গোষ্ঠীর চিন্তানায়কেরা ধীরে ধীরে এই পরিবর্ত্তন সাধন করিতে চান। ইঁহারা ক্রমবিবর্ত্তনে বিশ্বাসী। মিল প্রভৃতি উদারনৈতিক রাষ্ট্রবিদেরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আর এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ আছেন যাঁহারা বিপ্লবপন্থী। বৈপ্লবিক রাজনৈতিকেরা রাষ্ট্র, সমাজ বা অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন কামনা করেন এবং তদনুযায়ী নীতি ও কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন! রুশো, কার্ল মার্কস্ প্রভৃতি দার্শনিক এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

বিবর্ত্তনের ফলে কোন সুদূর অতীতে মানুষ পৃথিবীর ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কে জানে! মানবসমাজ সভ্যতার অভিযানে নানা অবস্থার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমানকালে উপনীত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ বিবর্ত্তনে মানুষের অর্থ-নৈতিক পরিবেশ একটি বিশিষ্ট ও ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। অর্থ-নৈতিক দিক হইতে মানব ইতিহাস বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। শিকারের যুগ মানব ইতিহাসের প্রথম যুগ ; এই যুগে মানুষ কোন কোন বন্য হিংস্র প্রাণীর ন্যায় ছোট ছোট দল গঠন করিয়া পশুশিকারের দ্বারা নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। দ্বিতীয় যুগকে সমাজতত্ত্ববিদেরা পশুপালনের যুগ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। এই যুগে মানুষ বন্য পশুকে আয়ত্তে আনিয়া গৃহপালিত করিবার বুদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছে। এই দুই যুগেই মানুষ যাযাবর ; তাহার কোন স্থায়ী বাসস্থান নাই। তৃতীয় যুগে মানুষ কৃষিবিদ্যার সন্ধান লাভ করিয়াছে এবং উর্ব্বরা নদী উপত্যকায় স্থায়ীভাবে নিজ বসবাস স্থাপন করিয়াছে। চতুর্থ যুগই বর্ত্তমান শিল্পের

যুগ। প্রতিযুগের ধনোৎপাদন ব্যবস্থা মানুষের জীবনপদ্ধতিকে বিপুল ভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। আদিম মানুষ যখন আত্মরক্ষার জন্য সাহসী নেতার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছে, যখন প্রাকৃতিক শক্তির রোষ হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে, আদিম পুরোহিতের আদেশে, দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে তখনই রাষ্ট্রদর্শনের সূত্রপাত হইয়াছে। রাষ্ট্রদর্শনের ইতিগাস আদিম শিকারের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবে চলিয়াছে। রাষ্ট্রচিন্তার ধারা মানব ইতিহাসের ন্যায়ই সুপ্রাচীন। গিরি-নির্ঝরিণী যেমন সুদূর নিভৃত গিরিকন্দর হইতে বহির্গত হইয়া নানা গিরিসংকটের সঙ্কীর্ণ পন্থা অতিক্রম করিয়া অবশেষে সমতল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় এবং বিশালতা ও পুষ্টিলাভ করে তেমনি অজ্ঞাত অতীতে আদিম মানুষের জগতে যে নগণ্য চিন্তাটুকু আরম্ভ হইয়াছিল, যে শাসনপদ্ধতি আদিম মানুষের ক্ষুদ্রবুদ্ধিদ্বারা গঠিত হইয়াছিল, তাহাই পরবর্ত্তী যুগসমূহে সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক পরিবেশের প্রভাবে নানা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আধুনিক কালে বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে।

রাষ্ট্রদর্শনের ঐতিহাসিকেরা নানা সূত্র হইতে তাঁহাদের চিন্তার মালমশলা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। শাসনপদ্ধতি, দার্শনিকগণের গ্রন্থাবলী, রাষ্ট্রনায়ক ও চিন্তানায়কদিগের বক্তৃতাবলী, সাহিত্য, সরকারী দলিল, সাময়িক পত্র প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিকদের গবেষণার বিষয়বস্তু যোগাইয়াছে। এ্যাথেন্সের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, প্রজাতান্ত্রিক এ্যাথেন্সের রাষ্ট্রপতি পেরিক্লিসের বক্তৃতা, দার্শনিক প্লেটো ও এ্যারিষ্টটলের গ্রন্থাবলী, ইউরিপাইডিস ও এ্যারিষ্টোফেনীসের নাটকাবলী, থুকিডিডিসের ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন সূত্র হইতে গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনের ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু ও অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন।

প্রাচ্যজগতেই সর্ব্বপ্রথম স্থায়ী ও নিয়মতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত

হয়। প্রাচীন মিশর, আসীরীয়া, ব্যাবিলনীয়া ও পারস্যে যদিও স্থায়ী শাসনপদ্ধতি দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল তথাপি রাষ্ট্রদর্শন বলিলে যুক্তিমূলক যে সূক্ষ্ম চিন্তাধারাকে সূচিত করে এই সকল দেশে তাহার উদ্ভব হয় নাই। এই ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারত ও মহাচীনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয়। এই দুইটি দেশে শুধু যে স্থায়ী রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা নহে, সুচিন্তিত রাষ্ট্রদর্শনও জন্মলাভ করিয়াছিল। এমন কি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মতবাদ এবং সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শের সুস্পষ্ট আভাষ প্রাচীন হিন্দু ও চৈনিক গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে প্রাচীন গ্রীসে প্লেটো ও বিশেষতঃ এ্যারিষ্টটলের প্রভাবে রাষ্ট্রদর্শন যেমন একটি বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল প্রাচীন ভারত ও চীনে রাষ্ট্রচিন্তার তেমন উন্নতি সম্ভব হয় নাই। প্রাচীন গ্রীসকে সত্যই বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির জন্মস্থান বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসকে কয়েকটি বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করা যায়। (১) গ্রীসীয় যুগ : এই যুগে যে সকল চিন্তানায়কেরা রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্লেটো ও এ্যারিষ্টটল্ সর্ব্বপ্রধান। প্লেটোর কমিউনিজ্‌ম্ বা সাম্যবাদের আদর্শ সেই যুগের মানুষের কাছে এক নূতন পথের সন্ধান দেয়। এ্যারিষ্টটল্ যদিও প্লেটোর সাম্যবাদমূলক মতবাদের বিরোধিতা করেন তথাপি প্লেটোর ন্যায় তিনিও রাষ্ট্রকে মানুষের জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে প্রাধান্য ও ক্ষমতা দিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। রাষ্ট্রকেন্দ্রিক এই নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া গ্রীসের কোন কোন সোফিষ্ট এবং ষ্টোইক ও এপিকিউরিয়ান নামক দার্শনিক সম্প্রদায়দ্বয় ব্যক্তি-স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন।

(২) রোমক যুগ : রোমের রাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির মূলীভূত আদর্শ ব্যাপকভাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক মতবাদকে প্রভাবিত করিয়াছে। আইন ও শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই রোমের

মৌলিকতা; চিন্তার ক্ষেত্রে সিসেরো প্রভৃতি রোমক লেখকগণ বিভিন্ন গ্রীসীয় দার্শনিকদের মতবাদ সসম্ভ্রমে ও নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৩) মধ্যযুগ: মধ্যযুগে খৃষ্টধর্ম্ম বিপুলভাবে ইউরোপীয় জীবনধারাকে প্রভাবিত করে। ইহার ফলে তদানীন্তন খৃষ্টধর্ম্মের সর্ব্বাধিনায়কেরা অর্থাৎ পোপগণ সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ জুড়িয়া খৃষ্টধর্ম্মসম্মত এক বিরাট ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। হিল্‌ডেব্র্যাণ্ড বা পোপ সপ্তম গ্রেগরী এই মতাবলম্বীদের মুখপাত্র। এই মতবাদের প্রসারের ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং তাই রাষ্ট্রের স্বাধিকারকামী দার্শনিকেরা ইহার বিরুদ্ধে নিজ নিজ মতবাদ প্রচার করিতে থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ ইটালীয় কবি বিশ্বশান্তিকামী ডান্টে ও গণতন্ত্রের উপাসক মারসিগ্‌লিও এই ভাবের ভাবুক ছিলেন।

(৪) রেনেইসান্স যুগ: রেনেইসান্স যুগে মানুষের মন মধ্যযুগের ধর্ম্মান্ধতা ও কুসংস্কার মুক্ত হইয়া প্রাচীন গ্রীস-রোমের জ্ঞান বিজ্ঞান,-সাহিত্য-দর্শন ও শিল্পকলার বিশ্বাসী হইয়া ওঠে। বৈজ্ঞানিক ও ভৌগলিক আবিষ্কার মানুষের দৃষ্টিকে সুদূর প্রসারী করিয়া তোলে। এই সময়ে ইউরোপে জাতীয়তাবাদের ধারা সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। রেনেইসান্স যুগের সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্রদার্শনিক ছিলেন মেকিয়াভেলি। ইটালীকে বহিঃশত্রুর অধিকার হইতে মুক্ত করিবার জন্য জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ মেকিয়াভেলি প্রচার করেন যে জাতীয় একতা ও মঙ্গল সাধনকল্পে নীতিমূলক বা নীতিবিরুদ্ধ যে কোন উপায় অবলম্বন করা সকল রাজারই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। এই সময়ে ইংলণ্ডের দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিদ সার টমাস্ মোর মানবহিতৈষনা মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া লোক সমাজে কমিউনিজম্ বা সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার করেন।

(৫) রেফরমেশন যুগ: এই যুগে লুথার প্রভৃতি প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণ পোপের অনাচারের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং

পোপের একনায়কত্বে উত্যক্ত ইউরোপের রাজন্যবর্গের সাহায্যে নূতন ধর্ম্মপ্রচারে বদ্ধপরিকর হন। লুথার প্রভৃতি প্রচার করেন যে নিজ ইচ্ছানুযায়ী প্রজাশাসন করা রাজন্যবর্গের ঈশ্বরদত্ত অধিকার। এই প্রচারের ফলে অনেক দেশে নৃপতিদিগের স্বৈরাচার বৃদ্ধি পায়। হলণ্ডে স্পেনীয় নৃপতিবর্গের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ওলন্দাজেরা বিদ্রোহ উত্থাপন করে এবং ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্রের অভ্যুত্থান হয়। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ব্যক্তি-স্বাধীনতামূলক ও রাজতন্ত্রবিরোধী রাষ্ট্রনীতি প্রসার লাভ করিতে থাকে। রেফরমেশনের যুগে বর্ত্তমান সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের সূচনা দেখা দেয়। ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক বোদ্যাঁ সার্ব্বভৌমত্বের নীতি বৈজ্ঞানিক গঠিত করেন।

(৬) বিপ্লবের যুগ: এই যুগে রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে দুইটি বিপ্লব সংঘটিত হয়। একটি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং অপরটি ঐ শতাব্দীর শেষভাগে। মহাকবি মিল্টন, জন লক্ প্রভৃতি মণীষীরা চুক্তিবাদ বা Contract Theory র ভিত্তিতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণসার্ব্বভৌমত্ব বা Popular Sovereignty র বাণী প্রচার করেন এবং ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্স্, সার রবার্ট ফিলমার প্রভৃতি বিধিদত্ত অধিকারের দোহাই পাড়িয়া রাজার স্বেচ্ছাচারিতা সমর্থন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে টমাস্ হব্স্ রাজার সার্ব্বভৌম ক্ষমতার সপক্ষে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ Contract Theory বা চুক্তিবাদ প্রচার করিতে থাকেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণ-সার্ব্বভৌমত্বের বাণী ফরাসী দেশে ও আমেরিকায় প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। ইংরাজ অধিকৃত আমেরিকার উপনিবেশ-বাসীগণ ১৭৭৬ সালে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নামে ইংরাজ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হয় ও দীর্ঘ সাত বৎসর যুদ্ধের পর জয়লাভ করে। রাষ্ট্রদর্শনের দিক হইতে আমেরিকার স্বাধীনতা-ঘোষণাপত্র অতিশয় মূল্যবান কিন্তু

তদপেক্ষা মূল্যবান ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা। ফরাসী দার্শনিক মঁতেস্-কিউয়ে ও রুশোর সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ফরাসী বিপ্লব অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। এই বিপ্লবের ফলে সামন্ত তান্ত্রিকতার অবসান এবং গণতান্ত্রিক যুগের সূত্রপাত হয়।

(৭) ঊনবিংশ শতাব্দী: এই যুগে গণতন্ত্র ধীরে ধীরে অগ্রগতি লাভ করে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্পবিপ্লব জয়যুক্ত হয় এবং তাহার ফলস্বরূপ রাষ্ট্রিক ক্ষমতা সামন্তবর্গ বা জমিদারশ্রেণীর হস্ত হইতে ক্রমে শিল্পপতিগণের করায়ত্ত হয়। মিল্ স্পেন্সার প্রভৃতি ইংরেজ মনীষীগণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বাণী প্রচার করিতে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জার্ম্মানী বহুধাবিভক্ত ও ইংলণ্ডের তুলনায় অনগ্রসর ছিল। অল্পসময়ে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতিবিধানের জন্য কয়েকজন জার্ম্মান দার্শনিক এই সময়ে জার্ম্মানীতে রাষ্ট্রকর্ত্তৃক সামগ্রিক নায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁহাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হেগেল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হেগেলের রাষ্ট্রদর্শন জার্ম্মানীর জাতীয় প্রয়োজনীয়তার মূর্ত্ত প্রকাশ। তিনি প্লেটো ও এ্যারিষ্টেটলের ন্যায় ব্যক্তি স্বাধীনতার বাণী উপেক্ষা করিয়া রাষ্ট্রকে মানুষের জীবনের সর্ব্বময় নিয়ন্তা হিসাবে গ্রহণ করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। ধনিক ও মজুর শ্রেণীর স্বার্থের ভিতরে এক বিরাট সংঘাতের সৃষ্টি হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মার্কস ও এঙ্গেল্স প্রমাণ করেন যে শ্রেণীবিভেদ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব ধনিক তন্ত্রের অপরিহার্য্য অঙ্গ। তাঁহারা ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ communist manifesto তে শ্রেণীসংগ্রামের পথে ধনিকতন্ত্রের অবসান সম্বন্ধীয় মতবাদ প্রচার করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সাম্যবাদ ব্যতীত অন্যান্য সমাজ তান্ত্রিক আদর্শ গঠিত হইতে থাকে।

ইহার ভিতর বিবর্ত্তনবাদী সমাজতন্ত্র, গিল্ড-সমাজতন্ত্র ও সিণ্ডিক্যালিজম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে বিভিন্নদেশে শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া ওঠে।

উনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রদর্শন বিভিন্ন দিক হইতে প্রাণরস সংগ্রহ করিয়া দৃঢ় ও পুষ্ট হইয়া ওঠে। সমাজতত্ত্ববাদ, বিবর্ত্তনবাদ, মনস্তত্ত্ববাদ, ভৌগলিক ভাবধারা, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ববাদ রাষ্ট্রদর্শনকে প্রভাবিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোন হইতে বিভিন্ন রাষ্ট্র-দার্শনিকেরা নিজ নিজ মতবাদ গড়িয়া তোলেন।

(৮) বিংশশতাব্দীঃ উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদ ধনতন্ত্রবাদের সহিত মিলিত হইয়া পরদেশলোভী সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয় এবং সমগ্র পৃথিবীকে যুদ্ধবিগ্রহে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। বিংশ শতাব্দীর দুইটি বিশ্বযুদ্ধ এই বর্ব্বর জাতীয়তাবাদ, শোষনশীল ধনতন্ত্রবাদ ও পরস্বাপহারী সাম্রাজ্যবাদেরই নগ্ন প্রকাশ। এই শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা রুষ-বিপ্লবকে উপরোক্ত তিনটি মতবাদের বৈপ্লবিক প্রতিবাদ হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। রুষ-বিপ্লবে লেনিনের নেতৃত্বে মার্কসের রাষ্ট্রদর্শন জয়যুক্ত হয় এবং সাম্যবাদ শক্তিশালী হইয়া শ্রেণী সংগ্রামের পথে বিভিন্ন দেশে প্রসার লাভ করিতে থাকে। ধনতন্ত্রবাদ বনাম সাম্যবাদ এই শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের উপর পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অধিকাংশে নির্ভর করিতেছে সন্দেহ নাই।

একনায়কত্ব ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রবাদের দ্বন্দ্ব বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রদর্শনের আর একটি লক্ষ্যনীয় বিষয়। অন্যপক্ষে বর্ত্তমান শতাব্দীকে আন্তর্জাতিকতার যুগও বলা যাইতে পারে। এই যুগে দুইটি মহাযুদ্ধের পর পর জাতিসঙ্ঘ ও সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিকতার আদর্শের ভিত্তিতে স্থাপিত হয়। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব উন্নতির ফলে মানুষ আজ সর্ব্ববিধ্বংশী আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার সন্ধান পাইয়াছে।

সম্মিলিত জাতি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। কিন্তু সর্ব্ববিধ্বংসী মারণাস্ত্রের আস্ফালনে এবং রাশিয়া ও আমেরিকার ক্রমবর্দ্ধমান বিরোধে শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত হইয়াছে।

সমগ্রদৃষ্টিতে যদি রাষ্ট্রদর্শনের বিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় তাহা হইলে কয়েকটি সত্য স্পষ্টরূপে উদঘাটিত হয়। বিভিন্ন যুগের রাষ্ট্রচিন্তা বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রতিযুগের মানব-মনের গঠন ও গতির ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেই যুগের রাষ্ট্রদর্শনের ভিতর। রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসের মধ্যদিয়া আমরা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের মনোরাজ্যের সঙ্গে সংযোগ ও পরিচয় স্থাপন করিতে পারি। ইহাও সামান্য কথা নহে। তাহা ছাড়া রাষ্ট্রচিন্তার ক্রমবিকাশ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্ত্তনের ধারার সুস্পষ্ট আভাস দেয়। কিন্তু সর্ব্বোপরি রাষ্ট্রদর্শন ভবিষ্যতের অন্ধকার পথে আলোকপাত করিয়া মানুষের ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাত্রাকে সহজ করিয়া তুলিতে পারে।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রিক ও সমাজব্যবস্থার অসাম্য, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দরিদ্রের উপর ধনিকের দাম্ভিক অবিচার মানবসভ্যতাকে কলুষিত করিয়াছে। আজ গণতন্ত্র ও ন্যায় যুদ্ধের নামে পৃথিবীব্যাপী হত্যার বিরাট ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। সাধারণ মানুষের সুখশান্তি মিথ্যায় পর্য্যবসিত হইয়া গেল। সভ্যতার এই নিদারুণ সঙ্কট মুহূর্ত্তে রাষ্ট্রিক আদর্শ দীপবর্ত্তিকার ন্যায় বিভ্রান্ত মানবসমাজকে পথনির্দ্দেশ করিতে পারে। তাই ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতির এই ধারাবাহিক সুলিখিত ইতিহাসখানিকে আমি সাদরে সুধীসমাজের নিকট পরিচিত করাইতেছি।

বর্ত্তমান পুস্তক প্রণেতা আমার প্রাক্তন ছাত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় লেখক হিসাবে সুবিদিত। রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাস বাংলা ভাষায় ইতিপূর্ব্বে লিখিত হয় নাই। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এই এই ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। তাহার প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা যে সফলতা লাভ করিয়াছে

তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা, মণীষা ও লিখনভঙ্গীর প্রভাবে এই গ্রন্থখানি বাংলাভাষায় প্রকাশিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকাবলীর মধ্যে উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়াছে।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা

আমরা যতদূর জানি বা আমাদের পক্ষে যতদূর জানা সম্ভব তা থেকে বলতে পারি যে সুসংবদ্ধভাবে প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা-ধারার উদ্ভব হ'য়েছিল প্রাচীন গ্রীসে যিশুখৃষ্ট জন্মবার প্রায় ৫০০ বছর আগেই। একথার এ অর্থ নয় যে গ্রীকদের আগে আর কোন জাতি বা দেশ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের সংস্রবে আসেনি অর্থাৎ আর কোন দেশের লোকেই রাজার সঙ্গে প্রজার সম্বন্ধ, সরকারের ক্ষমতা ও কাজ, আইনকানুনের উৎপত্তি প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায়নি। বরং ব্যাপারটা সম্ভবতঃ ঠিক উল্টো। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে প্রাচীন ব্যাবিলন, মিশর ও ভারতে ঐ সমস্ত ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছিল এবং ঐ সমস্ত দেশের অধিবাসীরা কতকগুলি ধারণায় পৌছেছিল। ভারতবর্ষের ও চীনদেশের পুরাণে ঐ সমস্ত বিষয়ের আলোচনার প্রমাণ যথেষ্ট পরিমাণে ছড়িয়ে আছে; কিন্তু ছড়িয়েই আছে এক সঙ্গে গেঁথে একটা রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা গ'ড়ে তোলা সম্ভবপর আজ পর্যন্ত হ'য়ে ওঠেনি।

মহাভারতে আমরা রাষ্ট্রনীতির যথেষ্ট পরিচয় পাই; তেমনি পাই প্রাচীন মিশরের উপকথায়। মহাভারতের আগের যুগের সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতায় অর্থাৎ মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার সভ্যতায় রাষ্ট্র-নীতি কতদূর এগিয়েছিল তা অবশ্য জানা যায় না কারণ ঐ সভ্যতার খোঁজই পেয়েছি আমরা এই বিশ শতকে। তেমনি জানা যায় না

সুমের, মেম্ফিস, উর, নিনেভে, ওফিরের কথা। তবে জানা যায় প্রাচীন মিশরের, প্রাচীন ব্যাবিলনের নরপতিদের কথা। প্রাচীন মিশরের নরপতিদের বলা হ'ত ফ্যারাও। ফ্যারাও ছিলেন দেবতারই সামিল; ব্যাবিলনাধিপতিরা ছিলেন দেবতার পুত্র। আমাদের মহাভারতের সমান্তরাল আর কি! যুধিষ্ঠীর, ভীম, অৰ্জ্জুন সকলেই দেবতার অংশ। অৰ্জ্জুন গাণ্ডীব ধ'রতে পেরেছিলেন দেবতার পুত্র ব'লে, ফ্যারাও দেশ-শাসন করতেন দেবতা ব'লে। দেবতা না হ'লে রাজা হবে কি করে? হিব্রুরা অবশ্য এক ধাপ নেমে এসেছিল। তাদের শাসকরা দেবতা ছিলেন না, দেবতার পুত্রও ছিলেন না তবে দেবতার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল মর্ত্যে দেবতার প্রেরিত প্রতিনিধি বলে। সুতরাং রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা ছিল ঐ দেবতা-প্রেরিত মহাপুরুষের হাতে এবং তিনি পুরোহিতদের সঙ্গে ভাগ ক'রে, রফা ক'রে ক্ষমতার ব্যবহার ক'রতেন কারণ নরপতির পরই পুরোহিতদের ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের হাতেই যে স্বর্গের চাবিকাটি। সুতরাং "ব্রাহ্মণ, রাজা ছাড়া আর কিছু নাই ভবে পূজা করিবার"।

অতএব দেখা গেল প্রাচীনকালে রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্ম ছিল অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত। সমাজনীতি ছিল ধর্মনীতির একটা শাখা মাত্র। মানুষ পৃথিবীতে আসে পাপের ফলে; ধর্মাচরণ করে সে সেই পাপ মুক্ত হোক এই ছিল ধর্মের বাণী।

গ্রীকরা ব'ললে, 'আমরা মানিনা যে ধর্ম সকলের উপরে। মানুষের জন্য ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়। তোমাদের ঐ পুরাণকে আমরা সবার উপরে স্থান দিই না'।

ইতিহাসের যুগে গ্রীকরাই হ'লো প্রথম মানুষ যারা মাইথো-লজিকে থোড়াই কেয়ার করলে, বিজ্ঞান থেকে কুসংস্কারের ভূতকে মেরে তাড়িয়ে দিলে এবং বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে বাস্তবকে

দেখতে সুরু ক'রলে। সূর্যঘড়িতে বিশ্বকর্মা দম দিচ্ছেন, ধর্মাচরণ না করলে দম দেওয়া বন্ধ হবে এবং অন্ধকার রাত্রির শেষই হবে না—একথা তারা বিশ্বাসই ক'রলে না।

এ কথা সত্য নয় যে তারা বিগ্রহে ও দৈত্যদানবে বিশ্বাস ক'রত না, বরং একটু বেশী মাত্রায় ক'রত। এত বেশী মাত্রায় যে সেন্ট পল্‌ খৃষ্টধর্ম প্রচারের প্রথম যুগে যখন গ্রীসে যান, তখন তিনি ব'লেছিলেন যে এথেন্সে একজন মানুষের সাক্ষাৎ কঠিন কিন্তু বিগ্রহের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন নয়। বিগ্রহ বা দৈত্যদানবকে গ্রীকরা মানত বটে—তবে যতটুকু মানা দরকার, ততটুকুই। এই এই মানার উপর পড়েছিল প্রয়োজনীয়তার ছাপ ও চাপ, যেমন অভিজাত বাঙ্গালীর বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসবও হয় আবার বাইরে সাহেবদের পার্টিতে খাদ্যাখাদ্যও চ'লত। দোল, দুর্গোৎসব হ'লো ঐতিহ্য রক্ষা কিন্তু সাহেবদের পার্টি দেওয়া প্রয়োজনীয়তার পর্যায়ে প'ড়ত। গ্রীকরাও এই ঐতিহ্য রক্ষা ও প্রয়োজনীয়তাকে অদ্ভুতভাবে মিলিয়েছিল, ধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে তারা ঐক্য আনবার চেষ্টা ক'রেছিল। রাষ্ট্র ছিল ছোট ছোট এক একটা নগরী নিয়ে। তাই একই মন্দিরে পূজা ও উৎসবে সকলেরই যোগ দেওয়া সম্ভব হ'ত। যেমন গ্রামে একখানি বারোয়ারী পূজা হ'লে সবারই যোগদান করা সম্ভব হয়। সেইরূপ গ্রীকরা মন্দিরকে করলে মিটিং গ্রাউণ্ড এবং বাড়ালে তার ইউটিলিটি। পূজা ও উৎসব হ'ল রাষ্ট্রের কাজ পররাষ্ট্র বিভাগের মতই। ফলে গ্রীকদের নিপুণ হাতে ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি মিলে গিয়ে সৃষ্টি হ'ল—খিচুড়ির নয়—উপাদেয় মিষ্টান্নের। পলিটিক্স হয়ে দাঁড়াল মাথা আর রিলিজিয়ন্‌ তার উপর টিকি।

একথা স্বীকার ক'রতেই হবে যে রাষ্ট্রনীতির প্রধানত্ব ও ধর্ম থেকে বিচ্যুতি শুভ ফল প্রসব করেনি। কারণ এর ফলে প্রথম প্রথম

দার্শনিকেরা দিশেহারা হ'য়ে পড়লেন। তাইত'—ধর্মকেই যদি বাদ দিলাম ত' রাষ্ট্রনীতি দাঁড়াবে কার উপর? ফলে তারা খুঁজতে লাগলেন আশ্রয় এবং আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে অনেকে যেমন পাইথাগোরাস তপ্ত কড়া থেকে খোলা উনুনে পড়লেন। ধর্মতত্ত্ব থেকে রেহাই পেতে গিয়ে রাষ্ট্রনীতিকে পাইথাগোরাস্ নিয়ে ফেললেন অঙ্কশাস্ত্রের সীমানায়। ন্যায়—পাইথাগোরাস্ বললেন, ন্যায় হ'ল একটি বর্গমূল। এই বর্গমূলের মধ্যে আছে ঐক্য, সুসংবদ্ধতা, সহগুণতা ইত্যাদি। এই রকমভাবে পাইথাগোরাস ক'রে গেলেন এক গোল-মালের সৃষ্টি যে গোলমাল প্লেটোরও মাথায় ঢুকেছিল। প্লেটো বললেন, প্রকৃত নরপতি ও অত্যাচারীর মধ্যে তফাৎ হ'ল ৭২৯ সংখ্যা। পাইথাগোরাস ও প্লেটোকে ঐ অদ্ভুত অঙ্কশাস্ত্রীয় রাষ্ট্রনীতির জন্য লোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা কথা বললেও পাগল ব'লতে পারেনি—আপনি আমি হ'লে বা আমাদের চেয়ে অল্প বড় কেউ হ'লে প্রথমে মাথায় এক টন বরফ দিয়ে দেখত, না সারলে সোজা উন্মাদাগারে পাঠিয়ে দিত। কিন্তু পাইথাগোরাস্ হ'লেন একজন দার্শনিক যদিও রাষ্ট্রনীতিবিদ নন। এক বিষয়ে বড় হওয়ার অনেক সুবিধা—অন্য বিষয়ে পাগলামি করলেও লোকে আর্ষপ্রয়োগ বলে ক্ষমা করে।

পাইথাগোরাসের ব্যাপার দেখে গ্রীসের দার্শনিকরা ভয় পেয়ে গেলেন। এ আবার কি? ও পথে গেলে ত' চ'লবে না। তখন তাঁরা সোজা পাইথাগোরাসকে "অসম্ভব" ব'লে উড়িয়ে দিলেন। অচল জিনিষ চালানো শক্ত। পাইথাগোরাসের মত দার্শনিকও অচল থিওরি চালাতে পারলেন না।

পাইথাগোরাসের পর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন সোফিষ্টরা। এবং সোফিষ্টরাই হ'লেন প্রথম রাষ্ট্রনৈতিক সুচিন্তাবীরের দল যাঁদের কাছে জগৎ চিরকালই শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে আসছে। সোফিষ্টরা

ছিলেন তখনকার দিনের পণ্ডিত ; তাঁরা সারা য়ুরোপ ঘুরে তখনকার সকল রকম বিদ্যাই শিক্ষা দিয়ে বেড়াতেন। তাঁদের একদল এলেন গ্রীসে। গ্রীসে এসে মানসিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে ও চিন্তাধারায় বিপ্লব ঘটিয়ে দিলেন। শিক্ষা দেবার জন্য তারা গ্রীসের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে রীতিমত পারিশ্রমিক আদায় ক'রতে লাগলেন। শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক নেওয়াটা গ্রীকরা ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। শেখাবে তার জন্য আবার পয়সা? যেমন অনেক মুসলমান আজও মনে করেন, টাকা জমা রেখে আবার সুদ ?

শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক নেওয়াটা গ্রীকরা ঘৃণার চক্ষে দেখতেন— শুনে অনেক শিক্ষক হয়ত' চমকে যাবেন। পারিশ্রমিকের জন্যই ত শিক্ষা দেওয়া, পেট ভরাবার জন্যই ত' বিদ্যা—কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট যেমন ভাবেন যে আর্ট হ'ল ব্যক্তিগত কমার্শের জন্য। শিক্ষকরাও তেমনি স্কুলে, কলেজে দিনগত পাপক্ষয় ক'রে, প্রকৃত শিক্ষা দেন প্রাইভেট টুইশানির ছাত্রকে কারণ সেখানে বিদ্যাদানে কৃপণকে যে কোন মুহূর্তে চলে আসতে হয়—অভিভাবকের ইঙ্গিতে ; সুতরাং সেখানে বলতে হয় "উজাড় করে লও হে আমার যা কিছু সম্বল"।

সোফিষ্ট শব্দটা এসেছে একটা গ্রীক শব্দ থেকে যার অর্থ হ'ল 'জ্ঞানী'। আবার এই 'জ্ঞানী' শব্দটা এসেছে আর একটা গ্রীক শব্দ থেকে যার অর্থ হ'ল 'চিন্তা করা'। সোফিষ্টরা ঢাক পেটালেন যে তাঁরাই জ্ঞানী যেহেতু তাঁরা চিন্তার দ্বারা চালিত হন ভাবের দ্বারা নয়। তাঁরা আরও জানাতে লাগলেন যে তাঁদের চিন্তা তাঁদেরকে কি কি অভিজ্ঞানের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। বুক ফুলিয়ে প্রচার করতে লাগলেন যে তাঁরা ঐতিহ্যময় ধর্ম ও চিরাচরিত নীতির অনুশাসন মানেন না— মানা মানেই বোকামি। জ্ঞানী কখনও কি বোকা হয় ? বোকামি এই জন্য যে ধর্ম, নীতি, দেশাত্ম-

বোধ, নাগরিকতা ইত্যাদি গালভরা শব্দ হ'ল বড় কর্তাদের অর্থাৎ শাসকদের অস্ত্র অপর সকলকে ঠকাবার জন্য। শক্তিতে বড় কর্তারা দুর্বল, তাই তাদের উর্বর মস্তিষ্ক বের ক'রেছে এই সব গালভরা কথা নিজেদের গাল ভরাবার জন্য। শক্তিতে তাঁরা ত আর জনসাধারণের সঙ্গে পারবেন না, তাই জনসাধারণের পরিশ্রম ফলভোগের কৌশলটুকু আয়ত্ব করেছেন অনন্তসাধারণ কৌশলে। খাটবার ক্ষমতা যখন নেই, তখন ঠকিয়ে খাও, আইনের সাহায্যে চোরা কারবার কর; সুতরাং সাধারণের কর্তব্য হ'ল ঐ সব ধর্ম-নীতি-টিতিকে সোজা কদলী প্রদর্শন করা।

সোফিষ্ট বললেন দেশাত্মবোধ কি জন্য? রাষ্ট্র বড় না নাগরিক বড়?

গ্রীকরা ভাবতে লাগল, তাই ত',—রাষ্ট্র বড় না নাগরিক বড়? সোফিষ্ট বললেন, ভাববার কি আছে? নাগরিক বড়—একথা চিন্তাশীলকে স্বীকার করতেই হবে। নাগরিক যখন বড়, তখন পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে সকলের ব্যক্তিগত অধিকার। মানুষ নিজেকে ফুটিয়ে তুলবে, তার জন্য রাষ্ট্রের বাধা সে মানবে কেন? কয়েকজন রাষ্ট্রের তক্তে বসে আইন করবে এবং 'জোর যার মুলুক তার' নীতির বলে নিজেদের অধিকারের সংখ্যা বাড়াবে—এ তোমরা কখনও স্বীকার ক'রবে না, হে যুবকগণ!

এই ভাবে তাঁরা শেখালেন যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি পরস্পরের মধ্যে চুক্তি দ্বারা, আইন মানার অর্থ হ'ল কাপুরুষতা অধিকার হ'ল শক্তিরই নামান্তর এবং চিরাচরিত নীতির অনুশাসন যিনি মানেন না তিনিই হ'লেন মহামানব। সোফিষ্টদের এই মতবাদের সঙ্গে সাম্প্রতিক যুগের হিতবাদীদের মতের মিল আছে এবং তাঁরা মেকিয়াভেলি, হেগেল ও ট্রিজেকের পথপ্রদর্শক।

পাইথাগোরাসের পর ধর্ম ও নীতির নামে রাষ্ট্রনীতিকে এমন এলোপাতাড়িভাবে চালানো হয় যে সাধারণ লোকের জীবন হয়ে ওঠে শশব্যস্ত। তাই রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে সম্বন্ধের সমস্যা গ্রীসের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। এই সমস্যার একটা প্রজ্ঞামূলক সমাধানের হ'য়ে প'ড়ল ভীষণ দরকার। সোফিষ্টদের কৃতিত্ব এইখানেই যে তাঁরা এই সমস্যার সমাধানের সন্ধান দেবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রোটাগোরাস ছিলেন সোফিষ্টদের মধ্যে সব চেয়ে বড়। সমালোচকরা সোফিষ্টদের বিরুদ্ধের যাই বলুন না কেন সক্রেটীস ও প্লেটোর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় সোফিষ্টদের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে।

মতবাদ ত' সোফিষ্টরা প্রচার করতে লাগলেন কিন্তু তার ফলাফল অতি সাংঘাতিক হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা দেখা দিল কারণ তাঁরা যা কিছু প্রচার করছিলেন, তারই সঙ্গে গ্রীক রাষ্ট্রগুলির প্রচারিত মতবাদের সংঘাত হতে লাগল। সংঘাতের ফলে গ্রীকদের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনতরী টলটলায়মান হ'য়ে উঠল। ঐতিহ্যের প্রতি ভক্তিমান্ রাম-শ্যাম-যদুর মত দার্শনিকের পক্ষে আর হাল ধরে রাখা সম্ভব হ'ল না। দরকার হল একজন হালীর যে এই টাইফুনের মধ্যেও তরী কিনারায় ভিড়াতে পারবে। যিনি পেরেছিলেন তিনি হ'লেন চিরস্মরণীয়, প্রাতঃস্মরণীয় অর্থাৎ স্মরণীয়ের সুপারলেটিভ্ সক্রেটীস।

সক্রেটীস এক লাইনও লেখেন নি—মুখে মুখে ছাত্রদের শিখিয়েই গেছেন; কেয়ারও করেন নি তাঁর দেওয়া শিক্ষা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত হ'ল কি না। কিন্তু কপাল গুণে গোপাল মেলে—সক্রেটীসেরও মিলেছিল দু'জন ছাত্র যাঁরা তাঁর জীবন ও তাঁর শিক্ষা লিপিবদ্ধ করে গেছেন অশেষ নিপুণতার সঙ্গে।

একজন হ'লেন প্লেটো-গুরুকা শিষ্য, যাঁর কাছে আমরা ঋণী সক্রেটীসের অনস্থকরণীয় সংলাপ সংরক্ষণের জন্য—আর একজন হলেন জেনোফন্ যিনি সক্রেটীশের জীবনী আমাদের কাছে দিয়ে গেছেন।

আটচালাতে-পাঠশালাতে-হাঠ-বাজারে-ভাটপাড়াতে-কাঠের-গোলায় পাটের ক্ষেতে যেখানেই তিনি সোফিষ্টদের বা সোফিষ্টদের মতের দিকে ঢলেছে এমন নাগরিক বা শিক্ষার্থীর দেখা পেতেন সেখানেই তিনি তার সঙ্গে দর্শন ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় নিয়ে তর্ক জুড়ে দিতেন—প্রলাপ বকে নয়—অনস্থকরণীয় সংলাপ দিয়ে যে সংলাপ আজও বিশ্বের বিস্ময়। এই সংলাপের মধ্যে পদে পদে আছে আছে যুক্তি যে যুক্তির সিঁড়ি বেয়ে এমন উঁচুতে প্রতিপক্ষকে উঠতে হয় যেখানে সোফিষ্টদের সিদ্ধান্তের "জ্যোৎস্না সুপ্তি" "স্বপ্ন মায়া বলে মনে হয়, অতি ক্ষীণ, অতি ছায়াময়"।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। সক্রেটীস জিজ্ঞাসা করলেন একজন সোফিষ্টকে, বলত হে 'ন্যায়' বলতে তুমি কি বোঝ? সোফিষ্ট উত্তর দিলেন, 'ন্যায়ের' অর্থ হ'ল আমার কাছে যে যা পায় তাকে তাই ফেরৎ দেওয়া—অর্থাৎ যে কোন রকম ঋণ শোধ করা।

সক্রেটীস বললেন, ভালো! আচ্ছা ধরো, কোন বন্ধু তোমার কাছে একখানা ধারালো অস্ত্র জমা রেখেছে। হঠাৎ সে পাগল হ'য়ে গেল। পাগল হ'য়ে তোমার কাছে অস্ত্রখানি চাইতে এলো, তোমার নিশ্চয়ই তার দ্রব্য তাকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। কি বল?

সোফিষ্টের তখন বাংলার অন্ততম ধ্বন্যাত্মক শব্দ 'আমতা আমতা' অবলম্বন করা ছাড়া আর কিছুই উপায় থাকে না।

এই ভাবে সোফিষ্টরা যা কিছু শিখিয়েছিলেন তারই ভুল বার ক'রতে লাগলেন সক্রেটীস এবং দেখিয়ে দিতে লাগলেন যে ঐ রকম শিক্ষা দেওয়ার কি মারাত্মক ফল হ'তে পারে। সক্রেটীস প্রমাণ

করলেন যে রাষ্ট্র অকৃত্রিম, রাষ্ট্র মানুষের সৃষ্ট নয়—রাষ্ট্র হ'লো অপৌরষেয় সুতরাং শাশ্বত এবং অবশ্যম্ভাবী। আইন পবিত্রতায় ভরা সুতরাং ইচ্ছা ক'রলেই আইনকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না; সম্প্রদায় হ'লো ব্যক্তিগত স্বার্থের উপরে এবং সরকার এমন একটা কর্তব্য যা পালন ক'রতে সেখানে রাষ্ট্রীয় সমাজের প্রত্যেক জ্ঞানী ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তির যাওয়া উচিত।

সক্রেটীস ছিলেন এথেন্স সিটি ষ্টেটের বা নগরী রাষ্ট্রের নাগরিক। যুবকেরা দলে দলে সোফিষ্টদের 'ডিক্যাম্প' ক'রে সক্রেটিসের পতাকা তলে আসতে লাগল। সোফিষ্টরা ব'লতেন যে 'সোফিষ্ট' কথা থেকেই বোঝা যায় যে তাঁরাই জ্ঞানী—ইন্টেলিজেন্‌সিয়া অফ্‌ দি ডে। সক্রেটীশ ব'ললেন আমি জ্ঞানভাণ্ডারের দোরগোড়াতেই পৌছুতে পারিনি।

এথেন্সের নাগরিকেরা গেল ডেল্‌ফিক্‌ ওরাকেলের কাছে বা ডেলফাইয়ের জ্ঞানমন্দিরে। ডেলফাইয়ের জ্ঞানমন্দির হ'ল প্রাচীন গ্রীসের এক দেবতার মন্দির যেথাকার পুরোহিত হ'লেন ত্রিকালজ্ঞ; যুদ্ধের পূর্বেই তিনি ব'লতেন যুদ্ধের ফলাফল, বাণিজ্য জাহাজ নঙর তুলবার পূর্বেই বলতেন বাণিজ্য জাহাজ ফিরবে কি না বা কি অবস্থায় ফিরবে ইত্যাদি—সবই। নাগরিকেরা জিজ্ঞাসা করল, গ্রীসে সবচেয়ে জ্ঞানী কে?

ওরাকল্‌ উত্তর দিলেন, সক্রেটীস।

সক্রেটীসকে যখন সে কথা জানানো হ'ল তখন তিনি বললেন যে বোধ হয় কথাটা সত্য, কারণ সমগ্র গ্রীসে তিনিই হ'লেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি নিজেকে অজ্ঞ ব'লে মনে করেন আর সকলেই ভাবে যে তারা মহাজ্ঞানী।

এই ঘটনার পর থেকে সক্রেটীসের দল আরও ভারী হ'তে লাগল।

দল ভারী হওয়া সব সময় ভাল নয়! বড় হ'তে দেখলে বড়দের দৃষ্টি পড়ে, তখন তাঁরা চাপ দিয়ে আবার ছোট ক'রে রাখতে চান।

সোফিষ্টদের মতামত ও সিদ্ধান্তগুলিকে খণ্ডন ক'রে সক্রেটীস নিজের যে মতবাদ প্রচার ক'রতে লাগলেন তার সঙ্গে এথেন্সের প্রচলিত ধারণা ও সিদ্ধান্তের মোটেই খাপ খেল না। খাপ খাওয়ার কথাও ত' নয়! যদি সক্রেটীসের সিদ্ধান্ত এথেন্সের গতানুগতিকতার সঙ্গে মিলত তা হ'লে সক্রেটীসের পক্ষেও সোফিষ্টদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীদের মন পুনরায় জয় ক'রে নেওয়া সম্ভব হ'ত না। এথেন্স-বাসীরা ভাবল এ আবার কি হ'ল? বনে চোর তাড়াতে গিয়ে যে বাঘের মুখে পড়লুম!

তারা সক্রেটীসকে সোফিষ্টদের চেয়েও ভয় ক'রতে লাগল। সোফিষ্টরা মূর্তি ভেঙেই গেছেন, নূতন কিছু গ'ড়তে তাঁরা পারেননি। তাঁরা ছিলেন সুলতান মামুদ, ভেঙেই তাঁদের আনন্দ—কিন্তু সক্রেটীস হ'লেন সাজাহান। পুরোনো ভিত্তিতে তিনি নাড়া দিয়ে গেছেন সত্য, কিন্তু তা কেবল তাজমহল গড়বার জন্য। এথেন্সের গণতন্ত্রকে তিনি যতরকমে পারেন বিদ্রূপ ক'রেছেন—এই বিদ্রূপ হ'লো কেবল মাত্র এই জন্য যে গণতন্ত্র যাতে জনশাসনে পরিণত না হয়।

অন্যায় তা সে যে রকমেরই হোক না কেন সক্রেটীসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও তীব্র সমালোচনা থেকে রেহাই পায়নি। এথেন্সের গণতন্ত্রের অকর্মণ্যতা তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে লাগলেন। কিন্তু মানুষ কি দোষ দেখালেই দেখে? বরং যে চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় তার আঙুল ভেঙে দেবার ইচ্ছাই হয় বলবতী। এথেন্সবাসীদেরও ঠিক ঐ ইচ্ছাই হ'য়েছিল। তারা বললে, সক্রেটীস দেশ-ধর্ম-নীতিদ্রোহী। বিচার হ'লো। বিচারকেরা নাগরিকদের কথার প্রতিধ্বনি ক'রলেন।

সক্রেটীস বিষপানে মৃত্যু বরণ ক'রলেন। পুরাণে আছে যে শিবের বিষপানে পৃথিবী পেয়েছিল রক্ষা কিন্তু সক্রেটীসের বিষপানে ফল হ'লো ঠিক তার উলটো ; বিষ ঢুকল এথেন্সের সব শরীরে এবং পরিণতি হ'ল ভয়াবহ।

প্লেটো

প্লেটো

প্লেটোর কথা বলবার আগে সিনেমার ফ্ল্যাস্ ব্যাকের মত পিছনের কথায় ফিরে আসা যাক। পিছনের কথা ব'লতে আমি প্রাচীন গ্রীসের পরিবেশের কথা বলছি যে পরিবেশে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় উদ্ভব হ'য়েছিল সম্ভব। এই পরিবেশের কথা না ব'ললে প্লেটোকে বোঝান শক্ত হবে। পরিবেশের মধ্যে পড়ে গ্রীসের ভূগোল. নগরী-রাষ্ট্র গুলির শাসন পদ্ধতি ও নাগরিকদের জীবনধারণ পদ্ধতি।

গ্রীস একটা উপদ্বীপ অর্থাৎ তিনদিকে জল দিয়ে ঘেরা ভূভাগ। এই উপদ্বীপের মধ্যে মাঝে মাঝে পেট ফুঁড়ে ঢুকে পড়েছে ইজিয়ান সমুদ্র। গ্রীসের কোন স্থানই সমুদ্র থেকে বেশী দূরে নয়। ফলে গ্রীকরা হয়ে উঠেছিল সমুদ্রগামী ও উপনিবেশ-স্থাপনকারী। এই সব উপনিবেশে যারা বাস করত গ্রীকরা তাদের বলত বর্বর, আর্যেরা ভারতে এসে যেমন আদিম অধিবাসিদের ব'লত রাক্ষস, বানর ইত্যাদি। এই বর্বরদের শায়েস্তা রাখত গ্রীকরা তরবারির সাহায্যে, তাদের প্রতি-বাদের ফলকে ভাসিয়ে দিত রক্তস্রোতে। ছোট উপদ্বীপ হ'লে কি হয়, সমগ্র গ্রীসে কখন একতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি; না হবার কারণ হ'ল প্রাকৃতিক বাধা। অজস্র পর্বত গ্রীসের গা ফুঁড়ে উঠে গ্রীসকে করেছে খণ্ড বিখণ্ড। এইসব পর্বতে ঘেরা এক এক খণ্ড জমি নিয়ে গড়ে উঠেছিল এক একটা নগরী, এবং নগরীগুলী গড়েছিল এক একটা রাষ্ট্র। নগরা রাষ্ট্র হ'তে পারে কিন্তু নগরী ত' একটা রাষ্ট্রের, তা সে যত ছোটই হোক না কেন, রসদ জোগাতে পারে না। তাই উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা। আবার এই উপনিবেশ নিয়েই বাধত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ।

সুতরাং গ্রীসের রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হ'ত এই রকম যুদ্ধের সম্ভাবনার দ্বারা।

সিটি ষ্টেট বা নগরী-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হ'ল এথেন্স ও স্পার্টা। এথেন্স ছিল গণতান্ত্রিক আর স্পার্টা হ'লো অলিগার্কিক বা সংকীর্ণতান্ত্রিক—কয়েকজন মিলে করত শাসন। এই এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে ছিল মাসতুতো ভাইয়ের সম্বন্ধ নয়, সাপ নেউলের সম্বন্ধ—এখন যেমন রাশিয়া ও আমেরিকায় সম্বন্ধ। স্পার্টা ও এথেন্সের শিক্ষা পদ্ধতিও ছিল ভিন্ন। এথেন্স গড়ত মানুষ এবং স্পার্টা গড়ত যন্ত্র। ছেলেবেলা থেকে স্পার্টা এমন শিক্ষা দিত যে শিশু যখন নাগরিক হয়ে উঠত তখন সে হ'ত যন্ত্রমাত্র। ছেলেবেলা থেকে সে রাষ্ট্রের শাসনাধীন, রাষ্ট্র তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে খাইয়ে দাইয়ে বড় ক'রে যখন সংসার-রাজপথে ছেড়ে দিত তখন এলোপাতাড়ি যাবার উপায় ছিল না, রাষ্ট্রের ষ্টিয়ারিং হুইলেরই নির্দেশ অনুসারেই চ'লতে হত। স্পার্টার শাসন সংস্কারক লাইকারগাস গড়তে চেয়েছিলেন একদল যোদ্ধা, হিটলারের মত,—সফলকামও হ'য়েছিলেন ঐ রকমই।

স্পার্টা ও এথেন্সের যে যুদ্ধ হয় তাকে বলা হয় পেলোপনেসিয়ার সমর। পেলোপনেসিয়ার সমর চলে অনেক দিন ধরে। পেলোপ-নেসিয়ার সমরের তিনটি যুদ্ধে প্লেটো লড়েছিলেন। অভিজাত বংশে তাঁর জন্ম। পিতার দিক দিয়ে শেষ এথেন্সের রাজা সোড্রাসের বংশধর ব'লে দাবী ক'রতেন আর মাতার দিক দিয়ে বিখ্যাত সংস্কারক সোলনের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যেত। তৎকালীন এথেন্সের নিয়ম অনুসারে তিনি যুদ্ধবিদ্যা ও ব্যায়ামে পারদর্শী হয়েছিলেন। যুদ্ধের মাঝে মাঝে যখন ফাঁক থাকত তখন তিনি বিজ্ঞান চর্চা করে ও কবিতা লিখে কাল কাটাতেন। তাহ'লে যোদ্ধারাও কবিতা লেখে বা-

কবিরাও যুদ্ধ করে! আমাদের দেশের নজরুল, ইংলণ্ডের রুপার্ট ব্রুক হ'লেন এই গোত্রীয়। ব্রুক ত' যুদ্ধক্ষেত্রেই কবিতা লিখতেন।

প্লেটোর বয়স যখন কুড়ি তখন দেখা হয় সক্রেটীসের সঙ্গে। সক্রেটীসের পাণ্ডিত্যে তিনি মুগ্ধ হ'লেন এবং অভিজনসুলভ মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে সক্রেটীসের শিষ্য হলেন। এবং সক্রেটীসের জীবনের বাকী আট বছর প্লেটো তাঁর গুরুর পদতলে বসেই তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে নিজের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ মিশিয়ে ফেলেছিলেন। দীক্ষার পর এই আট বছরের শিক্ষা প্লেটোর চিন্তাধারাকে এমন ভাবে সক্রেটীয়ান করে তুলেছিল যে প্লেটোর সংলাপের কোনখানটা প্লেটোর আর কোনখানটা সক্রেটীসের তা বোঝবার উপায়ই নেই।

এথেন্সের অজ্ঞ ও বিশ্বাসান্ধ 'গণতান্ত্রিকদে'র হাতে সক্রেটীসের মৃত্যু ঘটলে ঘৃণায় ও বেদনায় প্লেটো এই মহাপুরুষঘাতী নগরী ছেড়ে চ'লে যান এবং বার বছর অজ্ঞাতবাস করেন। অজ্ঞাতবাস অজ্ঞাত থাকে তাদের কাছে যারা ঐ বিষয়ে সেই সময়ে জ্ঞাত হ'তে চায়; অপর সকলের কাছে অজ্ঞাত জ্ঞাত থাকে এবং পরবর্তীকালে তা হ'য়ে দাঁড়ায় রোমান্স। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস কৌরবরা জানত না কিন্তু গোধন-হরণের সময় বিরাট রাজার পুত্র জেনেছিল। এই গোধন-হরণ মহাভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোমান্স। জয়প্রকাশ নারায়ণ বা অরুণা আসফ আলির অজ্ঞাতবাস ১৯৪২ সালের আন্দোলনের এক রোমান্টিক অধ্যায়। প্লেটোর অজ্ঞাতবাসেও যথেষ্ট রোমান্স আছে।

অজ্ঞাতবাসের বার বছর প্লেটো জগৎ ও মানুষ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতালাভ করেন। অজ্ঞাতবাসের সময় তিনি মিশর, সিসিলি, ও সাইরাকুজে যান এবং মিশরের বর্ণাশ্রম পদ্ধতি ভাল ক'রে শিক্ষা করেন। বার বছর পরে এথেন্সে,

ফিরে এসে তিনি একটী বিদ্যাভবনের বা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত এইখানেই শিক্ষা দিয়ে ও লিখে কাটান।

প্লেটো ছিলেন দার্শনিক তাই সাংসারিক বুদ্ধির ছিল একটু কমতি। সাইরাকুজের স্বেচ্ছাচারী রাজা ডায়োনিসস্ প্লেটোকে ডেকে পাঠান একটি আদর্শরাষ্ট্র গঠন করবার জন্য। সেখানে গিয়ে ডায়োনিসসের বিরুদ্ধে প্লেটো এমন কথা বলেন যে তাঁকে বন্দী ক'রে ক্রীতদাস ক'রে রাখা হয়। পরে অবশ্য ছাড়ান পান।

প্লেটোর জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে সক্রেটীসের মতবাদগুলিকে লিপিবদ্ধ করা ও পরিস্ফুট করা। এবং তা তিনি ক'রেছিলেন অনন্যসাধারণ নিপুনতার সঙ্গে। এই মতবাদের কয়েকটী হ'ল প্রথম, মানুষের অস্তিত্বের চরম আদর্শ পুণ্য; পুণ্য বলে জ্ঞানকে; তৃতীয়, মেধা যা হ'ল মানুষের জ্ঞানাধার—মানুষের সবচেয়ে বড় জিনিষ। এই নীতিগুলির প্রয়োগ প্লেটো রাষ্ট্রনীতিতে ক'রে তিনখানি সংলাপ-গ্রন্থ রচনা করেন, সে তিনখানি হ'ল 'দি রিপাব্লিক,' 'দি ষ্টেটস্ম্যান্ এবং 'দি লজ্' অর্থাৎ সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রনীতিবিদ্ এবং আইনকানুন।

কেতাব তিনখানির মধ্যে 'রিপাবলিক'ই সমধিক প্রসিদ্ধ। 'রিপাবলিক' বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। 'রিপাবলিক' রচনার উদ্দেশ্য হ'লো দুটি : (১) সোফিষ্টদের মতবাদের বিরুদ্ধে অভিযান করা। (২) তৎকালীন গ্রীক সিটি ষ্টেট বা নগরী-রাষ্ট্রগুলির কর্মপদ্ধতির তীক্ষ্ণ সমালোচনা করা।

সক্রেটীসের সময় থেকে সিটি ষ্টেটগুলো বিশেষ ক'রে এথেন্স অধঃ-পতনের পথে সড় সড় ক'রে নামছিল। এবং প্লেটোর সময়ে মাটিতে পৌঁছুতে আর বিশেষ বাকী ছিল না। প্লেটোর সময়ে সমাজে দ্বন্দ্ব চলছিল বিশেষ ক'রে দুই শ্রেণীর মধ্যে—ঐতিহ্য বলে যারা অভিজাত ও বাণিজ্য

বলে যারা সম্প্রতি হ'য়েছে ধনী তাদের মধ্যে। এই বণিক-ধনীরা অভিজাত বলে অভিহিত হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের প্রতি যাকে বলে ব্যবসায়মূলক বিশ্বাসঘাতকতা ক'রতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হ'তেন না। এই শ্রেণীর পথপ্রদর্শকদের অনুসরণ ক'রে ক্রমে নাগরিকেরা সাধারণভাবে কর্তব্যকে সেলাম ঠুকে বিদায় দিলে ; ফলে রাষ্ট্রের তরী চ'লল স্রোতের টানে, অজানায়।

প্লেটো দেখলেন যে এই রকম ভাবে স্রোতের টানে চ'ললে রাষ্ট্রতরণী তিনটি চোরা পাহাড়ের একটি না একটিতে ধাক্কা খেয়ে যাবে চূর্ণ হয়ে। পাহাড় তিনটি হ'ল : এথেন্সের নাগরিকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ; সিটি ষ্টেটগুলির পরস্পরের মধ্যে আত্মঘাতী সংগ্রাম ; এবং ম্যাসিডন রাজ্যের বিজয়-লিপ্সার কবলে পতিত হওয়া।

ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন দার্শনিকপ্রবর—কি ক'রে ঐক্য আনয়ন করা যায় ; কি ক'রে নাগরিককে তার কর্তব্য সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন ক'রে তোলা যায়—এক কথায়, কি ক'রে সিটি ষ্টেটের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করা যায়? এই লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের পথ তিনি নির্দেশ ক'রে গেছেন 'রিপাবলিকে'। পথনির্দেশেই তাঁর কর্ত্তব্যের ঘটেছে পরিসমাপ্তি ; পথ দিয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব কি না 'রিপাবলিকে' সে কথা ভাবেন নি ; ভেবেছিলেন পরে, আইন-কানুন বা লজে' এসে।

নাগরিকগণের এই কর্তব্যহীনতার বা কর্তব্যে উদাসীনতার কারণ কি? প্লেটো বললেন, 'অজ্ঞতা'। 'অজ্ঞতার কারণ কি?' অজ্ঞতার কারণ 'সোফিষ্টদের কুশিক্ষা,' প্লেটোর উত্তর এলো। 'রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্বন্ধ কি?' 'রিপাবলিকে' প্লেটো তারও উত্তর দিয়েছেন : সোফিষ্টরা বলেন যে রাষ্ট্র হ'ল একটা আবশ্যকীয় অন্যায় বা নেসেসারী ইভ্ল্ তা সম্পূর্ণ ভুল। একমাত্র রাষ্ট্রের আওতাতেই মানুষের পক্ষে সুন্দর, সার্থক জীবন যাপন সম্ভব। সুতরাং প্রত্যেক

নাগরিকের প্রথম কর্তব্য হ'ল রাষ্ট্রের প্রতি। তিনিই হ'লেন প্রকৃত মানুষ যিনি জীবনের প্রত্যেক পর্য্যায়ে নিজের কর্তব্য পালন করেন পূর্ণরূপে। এই কর্তব্যচ্যুতি ঘটলে মানবজীবন অপূর্ণ ও অসার্থকই হয়। পূর্ণরূপ কর্তব্য সম্পাদন বা শরীর পতনের দ্বারা মানুষ যদি সার্থক মানুষে পরিণত হয় তবেই সার্থক রাষ্ট্রের জন্ম সম্ভব।

এই রকম ভাবে 'রিপাবলিকে' প্লেটো ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে সার্থক রাষ্ট্রের জন্মকথায় গিয়ে প'ড়েছেন। তাঁর মতে মানুষ রাষ্ট্রেরই ক্ষুদ্র প্রতীক। এই প্রতীকের মধ্যে 'ন্যায়'কে যদি ভাল করে বসবাস করান যায় তবে রাষ্ট্রের মধ্যেও ন্যায়ের ঘর-বাঁধা সহজেই সম্ভব হবে। ন্যায়পরায়ণ মানুষ গড়তে পারলেই 'ন্যায়-রাষ্ট্র' বা রাম রাজ্য আপনা থেকেই গড়ে উঠবে।

প্লেটোর কল্পিত এই রাম রাজ্যে বা আদর্শ রাষ্ট্রে থাকবে মোট তিন শ্রেণীর লোক : (১) যারা করবেন শাসন (২) যারা করবে দেশরক্ষা এবং (৩) যারা করবে দেশের জন্য উৎপাদন। এই তিন শ্রেণীর বাইরে যদি কোন ফালতু শ্রেণী গজিয়ে ওঠে তবে ন্যায়-রাষ্ট্র অন্যায়-রাষ্ট্রে পরিণত হবে; সুতরাং, প্রহরী হও সতর্ক!

এই যে তিনটি শ্রেণী এদের আমাদের ভারতীয় অর্থে শ্রেণী মনে করলে মহা ভুল হবে। এই শ্রেণীবিভাগ হ'ল কর্মবিভাগ; রাষ্ট্রের জন্য কে কি কাজ করবে তারই নির্ধারণ। প্লেটোর কর্মবিভাগের সঙ্গে আমাদের বৈদিক বর্ণাশ্রমের অনেক মিল আছে। আমাদের বর্ণাশ্রমে ক্ষত্রিয় করতেন দেশশাসন কিন্তু অনেক সময় ব্রাহ্মণের উপদেশাদেশ অনুসারে। তাই শ্রীরামচন্দ্রের গুরু হলেন বশিষ্ঠ, ভীমার্জ্জুনের শিক্ষক দ্রোণাচার্য এবং চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দের উপদেষ্টা বা কাউন্সেলার হিসাবে কাজ করেছেন;

প্লেটোও শাসক সম্প্রদায়ের নাম দিয়েছেন অভিভাবক বা উপদেষ্টার দল।

প্লেটোর কল্পিত আদর্শরাষ্ট্র যখন ঐ তিন শ্রেণীর পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পুণ্যের ভিত্তি যখন তাঁর মতে জ্ঞান তখন শিক্ষাকে প্লেটো তাঁর রিপাবলিকে এক বিশিষ্ট স্থান দিয়েছেন। শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ ক'রবে ব্যক্তি নয়—রাষ্ট্র এবং এই শিক্ষার কবলে আসতে হবে প্রত্যেক নাগরিককে।

শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধেও প্লেটো 'রিপাবলিকে' বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর কল্পিত শিক্ষাপদ্ধতিতে এথেন্স ও স্পার্টা এসে অদ্ভুত-ভাবে মিলেছে। শিক্ষা তাঁর মতে প্রকৃতি-প্রদত্ত গুণাবলীকে উজ্জ্বলতর ক'রে তোলে মাত্র—নূতন কিছু গড়ে তোলে না। গুণাবলীকে পালিশ ক'রে চকচকে ক'রে তোলার ভার নিতে হবে রাষ্ট্রকেই সুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত।

জন্ম থেকেই শিশু মানুষ হবে সরকারী বালকাশ্রমে। সেখানে সরকারী মাতৃকুল স্তন্যপান করাবে শিশুদের। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই শরীরচর্চা ও বিদ্যাচর্চা একসঙ্গেই করানো হবে। শরীরচর্চার উপর অতখানি জোর দেওয়ার কারণ হ'ল যে প্রাচীন গ্রীকরা শরীরচর্চাকে বিদ্যাশিক্ষার অঙ্গ ব'লেই গণ্য ক'রতেন। শরীরচর্চার উদ্দেশ্যে যতরকম দুঃসাহসিকতার কাজ এমন কি চুরি করতেও উৎসাহ দেওয়া হবে। চুরি ক'রে কিন্তু ধরা প'ড়লে চলবে না। ধরা পড়লেই কঠিন শাস্তি দেওয়া হ'বে। 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা—' এ তাহ'লে প্লেটোরও কথা!

শিক্ষার পালিশ চলতে লাগল। যাতে ইস্পাতের সংস্পর্শ নেই, কেবলই লোহা তাকে বাদ দেওয়া হ'ল প্রথমেই। পালিশ করা হবে ইস্পাতকেই সুতরাং মেকিকে সরে পড়তে হবে সোজা। ছটা প্রফেসর রেখে, বাজারের সমস্ত নোট বই কিনে যে শিক্ষিত হওয়া যায় একথা

প্লেটো মোটেই বিশ্বাস করতেন না। যাতে ইস্পাতের সংস্পর্শ নেই তাকে আর কতটা উজ্জ্বল করে তোলা যায়? জ্ঞানে সকলের সমানাধিকার—এ মত তিনি কখনও সমর্থন করতে পারেন নি।

শিক্ষায় প্রথম যারা অপটুতা দেখালে তাদের ছাঁটাই ক'রে বহাল করা হ'ল শ্রমিকের কাজে বা দেশের জন্য উৎপাদনের কাজে। তার পরেও যারা রয়ে গেল অর্থাৎ এখনকার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করলে তাদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া হ'তে লাগল। শিক্ষার প্রতি স্তরে অর্থাৎ এখনকার আই-এ, বি-এ, এম-এ তে দলে দলে ছাত্র নির্মম হস্তে ছাঁটাই হ'তে লাগল এবং তাদের বহাল করা হ'ল দেশরক্ষার কাজে। কম্পার্ট-মেণ্টাল বা সাপ্লিমেণ্টারি পরীক্ষার সুযোগ দিয়ে এই ধরণের ছাত্রের পিছু অনর্থক সময়, অর্থ ও প্রয়াস অপচয় ক'রবার কোন ব্যবস্থাকেই প্লেটো তাঁর কল্পিত শিক্ষাপদ্ধতির ধারেকাছে ঘেঁসতে দেননি। সরাসরি পোষ্ট-গ্রাজুয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাঁরা হলেন 'মাষ্টার' তাঁদেরই করা হ'ল মাষ্টার বা অভিভাবক; দেশশাসন ও দেশরক্ষার অধিনায়কতার ভার দেওয়া হ'ল তাঁদেরই উপর। শিক্ষার স্তরের পর স্তর পার হ'য়ে যখন তারা নাগরিক বা সৈন্যদলের উপর অধিনায়কতার ভার পেলেন তখন বয়সে তাঁরা হবেন প্রায় ষাট—যে বয়সে আমাদের দেশের লোক (যদি ইতিমধ্যে তার স্বর্গ বা নরকপ্রাপ্তি না ঘটে থাকে) স্বর্গলাভের আশায় বা নরকগমনের আশঙ্কায় হরিনামের ঝুলি হাতে ক'রে ব'সে থাকে।

প্লেটোর কল্পিত রাষ্ট্রে চিকিৎসকের কোন স্থানই নেই। চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় তখনই যখন রাষ্ট্র জনস্বাস্থ্যকে গ'ড়ে তুলতে হয় অক্ষম। তাই তাঁর ব্যাধিশূন্য রিপাবলিকে প্লেটো পাবলিক হেলথ্‌কে গড়বার ব্যবস্থাই করে গেছেন—হাঁসপাতাল বা দাতব্য চিকিৎসালয় খাতে রাষ্ট্রের রাজস্বের একটা মোটা অংশ বরাদ্দ করে যাননি। তাঁর

থেরাপিউটিকে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই নাই। 'প্রিভেনসন্ ইজ বেটার দ্যান কিওর—এই নীতির তাৎপর্য প্লেটোর চেয়ে ভালো ক'রে আর কেউ উপলব্ধি করেননি।

মানুষের পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তার মধ্যে খাদ্য, আশ্রয়, পরিচ্ছদ ও সেক্স্। আর সমস্তকে বাদ দিলেও চলে—এই হ'ল প্লেটোর মত। এই চারটি অভাবকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে এবং অন্যান্য অতিরিক্তা-ভাবকে মানুষের অভাবের উর্বরক্ষেত্রে জন্মাতে না দিলে তবেই রিপাবলিক সৃষ্টি সম্ভব হবে। তার জন্য কি করতে হবে? এই উদ্দেশ্যে যে যে কাজ ক'রতে হবে, তার বিশদ বিবরণও দিয়ে গেছেন দার্শনিকপ্রবর: যেমন স্ত্রী-পুরুষে বৈষম্য সম্পূর্ণ দূর করতে হবে, পারিবারিক জীবনকে বিদায় দিতে হবে, সাম্যবাদ বা কম্যুনিজম্‌কে অবলম্বন ক'রতে হবে ইত্যাদি।

স্ত্রীলোক সন্তান ধারণ ও প্রসব করে এবং পুরুষ সন্তানের জন্ম দেয়—স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এই বৈষম্য প্লেটোর মতে বৈষম্যই নয়। পশুরাজ্যে এ বৈষম্য মূল্যহীন; বাঘিনী শিকারে ব্যাঘ্রপ্রবরের চেয়ে কোন অংশে কম পারদর্শী নয়। মানুষের রাজ্যেও এ বৈষম্য মূল্যহীন কিন্তু মানুষ অসঙ্গতরূপে একে অর্থময় ক'রে রেখেছে। সুতরাং প্লেটোর মত হ'ল 'বাঁধ ভেঙ্গে দাও, বাঁধ ভেঙ্গে দাও'...স্ত্রীলোক আসুক ঘরের বাইরে, সূর্যের প্রকাশ্য আলোকে, পুরুষের সঙ্গে করুক তারা সমান কর্তব্য-পালন এবং আদায় ক'রে নিক সমানাধিকার। স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে গ্রীক দার্শনিক এ যুগের কম্যুনিষ্টদের পথপ্রদর্শক ও ফেমিনিষ্ট্ ম্যুভমেণ্টের জন্মদাতা।

প্লেটোর মতে পারিবারিক জীবন আদর্শ রাষ্ট্রের জন্মের পক্ষে একান্ত প্রতিকূল। পরিবার থাকলেই আসবে পরিবারের প্রতি কর্তব্য এবং এই কর্তব্যের সঙ্গে সংঘাত হবে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যের।

সংঘাতে সকল সময়েই জয়ী হবে গৃহস্বামীর কর্তব্য; নাগরিক কর্তব্য লুটাবে ধুলায়—আস্তে আস্তে সমস্তই যাবে 'কপনী কা আস্তে।' সুতরাং পারিবারিক জীবনকে কর ধ্বংস; গড়ে তোল নূতন রাষ্ট্রীয় জীবন—আদর্শ রাষ্ট্রের জন্মের নূতন দিনের ভোরে। এই জীবনে আপন বল'তে কেউ থাকবে না আবার আপন বলতে থাকবে সকলেই। নিজের পুত্রকন্যা থাকবে না কিন্তু রাষ্ট্রের সকল শিশুই যে নিজের সন্তানসন্ততি!

পারিবারিক জীবনের অবকাশই বা কোথায়? আহার্য গ্রহণ করতে হবে যত্র তত্র—প্লেটোর পরিকল্পনায় সকলের সঙ্গে রাষ্ট্রের ভোজনালয়ে; শয়নও রাষ্ট্রের হর্ম্যমন্দিরে; ব্যাপৃত থাকতে হবে রাষ্ট্রের কাজে দিবসযামিনী—বিশ্রামও হবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। এমত অবস্থায় পরিবারের অবস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ কোথায়?

বিবাহ? সম্পূর্ণ ভুলে যাও,—প্লেটো ব'ললেন। বিবাহই পারিবারিক জীবনের মূলশিকড়। মূলশিকড়কে আগে কাটতে হবে না হ'লে ডালপালা যতই ছাঁট না কেন, আবার গজাবে।

বলা হয় যে প্রত্যেক ইংরেজের গৃহ হ'ল তার দুর্গ। 'ভেঙ্গে ফেল ঐ দুর্গের প্রাচীর',—প্লেটো বললেন, 'ওরই মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে যত সমস্ত সংকীর্ণ স্বার্থপরতা। প্রাচীর ভাঙ্গলেই আসবে বাইরের আলো, তখন অন্ধকারের প্রাণী সব ফিরে যাবে অন্ধকারে।'

বিবাহ ব্যবস্থার উচ্ছেদ মানে কি স্বৈরাচারের পথনির্দেশ? 'মোটেই নয়—বরং যৌন-সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ—টিক্ কন্‌ট্রোল,' প্লেটো উত্তর দিলেন। রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যপরীক্ষকেরা বাছবেন সুস্থ, সবল স্ত্রী ও পুরুষকে এবং বেছে ছাপ মেরে ছেড়ে দেবেন—হ্যাঁ, এরাই যৌনপ্রবৃত্তির নিবৃত্তির অধিকারী কারণ দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে এরা পেয়েছে পাশ-মার্ক।

পাশকরা স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হবে ক্ষণস্থায়ী উদ্বাহবন্ধনে—রোজ নয়, সপ্তাহেও নয়—মিলিত হবে প্রত্যেক পুণ্য তিথিতে—অমাবস্যা, পূর্ণিমা বা ঐ রকম কোন কোন তিথিতে। বিবাহের আর এক নাম হ'ল পরিণয়। পরিণয়ের পরিণতি দ্বিজেন্দ্র-লালের কথায় হ'ল 'পুত্রকন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা'। প্লেটো বললেন, দৃষ্টি দাও কেবল পরিণতির দিকে—গন্তব্যস্থানের দিকে সমস্ত লক্ষ্যকে কেন্দ্রীভূত কর, ভুলে যাও পথের কথা; সৃষ্টিই মুখ্য উদ্দেশ্য, আনু-ষঙ্গিকগুলোকে বাদ দিলেও চলে। চলে যখন তখন বাদ দাও। ভালবাসা এবং ভাল বাসা বা বাড়ীর কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই কারণ সন্তান ত' তোমার নিজের নয়। সন্তান হ'ল রাষ্ট্রের; রাষ্ট্রই তাকে বাসস্থান ঠিক ক'রে দেবে—ভাল খারাপ যাই হ'ক।

সন্তান মানুষ হবে সরকারী বালকাশ্রমে। সেখানে এসে সন্তানবতী নারী তুমি করিয়ে যাবে সন্তানকে স্তন্যপান। স্তন্যপান করাবে কেবল তোমার সন্তানকে নয়, আর পাঁচজনের সন্তানকেও কারণ তোমরা যে সরকারী মাতৃকুল! মোট কথা, কে তোমার সন্তান আর কে নয়, তা চেনবার কোন উপায়ই তোমার থাকবে না। সন্তানরাও তাদের মা'দের চিনবে না। চিনবে কেবল তাদের ভাইদের অর্থাৎ যাদের সঙ্গে যে মানুষ হচ্ছে সরকারী আশ্রমে।

সকলে ত' এক মায়ের সন্তান নয়? তাতে কি এসে যায়? সকলে ত এক রাষ্ট্রের সন্তান; তাই-ই যথেষ্ট; তারা যে ভাই ভাই; এই হ'ল সৌভ্রাত্রের পথ। এ পথ দিয়ে চললে রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড হবে শক্ত। সুতরাং হে এথেন্সের রমণীগণ! বিলিয়ে দাও তোমাদের নারীত্ব, তোমাদের মাতৃত্ব, তোমাদের গৃহলক্ষ্মীত্ব। তোমরা নাগরিকা—সমানাধিকারিণী, তোমরা তুচ্ছ নও, হেয় নও,—"ওগো তোমরা"।

ঘর ভাঙা ত' সমস্যার সমাধান নয়, সূত্রপাত মাত্র। প্লেটো ত'

ঘর ভাঙবার হুকুম দিলেন ; সমাজবন্ধন, বিবাহবন্ধন, স্নেহবন্ধন সবই চষে সমভূমি ক'রে ফেলতে চাইলেন। এই শূন্যভূমিতে তিনি কোন পুণ্যের বীজ ছড়াবেন ? প্লেটো বল'লেন, 'ছড়াবো এক নূতন অমৃতশস্যের বীজ। এ অমৃত পানে বা ভোজনে রাষ্ট্র হবে অমর।' এই অমৃত কি ? এ অমৃত হ'ল সাম্যবাদ বা কম্যুনিজম্।

প্লেটোর কম্যুনিজম্ হ'ল দারিদ্র ও গৃহহীনতার কম্যুনিজম। এই নিস্বতা ও গৃহহীনতার সাম্যবাদ প্লেটো তাঁর কল্পিত তিন শ্রেণীর জন্যই বরাদ্দ করে যান নি। এ কম্যুনিজমের কবলে আসতে হবে প্রথম দুই শ্রেণীকে অর্থাৎ শাসকসম্প্রদায় ও রক্ষক-সম্প্রদায়কে। প্রথম দুই শ্রেণীকে ছাড়তে হবে গৃহ, বিত্ত ও পরিবার এবং নিয়োজিত ক'রতে হবে সর্বস্ব (সর্বস্ব বলতে এখন নিজের শক্তি সামর্থই বোঝায়) রাষ্ট্রের কাজে। তৃতীয় শ্রেণী যাঁরা ক'রবে দেশের দস্ত উৎপাদন তাদের ত্যাগ করতে হবেনা বিভব—কম্যুনিজম্ তাদের জন্য নয়। তারা উৎপাদন করবে এবং উৎপাদনের একাংশ বা অধিকাংশ নিবেদন করবে রাষ্ট্রের চরণে। সেই নিবেদিত অংশে চলবে রাষ্ট্রের অপর দুই শ্রেণীর জীবনধারণ ও পুষ্টি। এই সাম্যবাদের সঙ্গে সাম্প্রতিক সাম্যবাদের কম্যুনিজমের কোনই মিল নেই বরং আছে ঘোরতর বিরোধ। সাম্প্রতিক সাম্যবাদ বলে যে উৎপাদনের ক্ষমতা থাকবে রাষ্ট্রের হাতে এবং উৎপন্নের বন্টন হবে সেখান থেকেই। প্লেটো কিন্তু উৎপাদনের গোড়া ধ'রে নাড়া দিতে চাননি। কেন ?

প্লেটোর রাষ্ট্র অধ্যাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে মানুষের মন ঘোরাতে হয় তরবারির সাহায্যে নয়, স্ট্রাইকের সাহায্যে নয়, সাবোটেজের সাহায্যে নয়—মন জয় করতে হয় শিক্ষার দ্বারা।

শিক্ষা 'উচ্চশ্রেণীর' মনকে গ্রাস করবে এমন ভাবে যে রাষ্ট্রই হবে তার একমাত্র আরাধ্য দেবতা ; মানুষ এমন যায়গায় এসে পৌছুবে যে সেখানে লিপ্সা, মোহ, তুচ্ছ আকর্ষণ যাবে লুপ্ত হয়ে এবং তার 'শত শৈবালিনী দেখিলেও ভালবাসিতে ইচ্ছা করিবে না।'

প্লেটোর কম্যুনিজমকে বলা হয় কম্যুনিজম ওফ্ কন্‌জিউমারস্ গুড্‌স্। বাস্তবজগতে এই সাম্যবাদের প্রয়োগ-সম্ভাবনা কতদূর তা 'রিপাবলিকে' প্লেটো ভেবে দেখেন নি। অত্যুদার আদর্শের পিছনে তিনি আলেয়াপ্রান্তের ন্যায় ছুটেছিলেন দ্বিবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে, থমকে দাঁড়ালেন 'লজ'এ এসে। 'লজ' বা আইনকানুনে তিনি কম্যুনিজমকে বাদ দিতে বললেন—চিরদিনের জন্য নয়, যতদিন সিটি ষ্টেটের নাগরিকগণ রিপাবলিক বা আদর্শ-রাষ্ট্রের উপযুক্ত না হয় ততদিন। সুতরাং 'লজ' হ'ল রিপাবলিকে পৌছোবার সিঁড়ি বা তাঁর কল্পিত রাম রাজ্যের ও সম্ভাব্য রাষ্ট্রনীতির মধ্যে একটা কমপ্রোমাইজ্ বা মীমাংসা—'লজ' হ'ল প্লেটোর মীমাংসা-দর্শন।

প্লেটোর সাম্যবাদ সবচেয়ে ঘা খেয়েছে শিষ্য এ্যারিষ্টটলের কাছে। 'পলিটিক্সে' এ্যারিষ্টল বললেন, 'এ কা কিয়া গুরুজী' ?

শেষের দিকে প্লেটোও বুঝেছিলেন যে তাঁর রিপাবলিক-এর প্রতিষ্ঠা হবেনা ততদিন যতদিন না দার্শনিকরা হন রাষ্ট্রনায়ক বা রাষ্ট্রনায়করা হন দার্শনিক।

আড়াই হাজার বছর পরে আমাদের এই ভারতবর্ষের এক অর্দ্ধ উলঙ্গ ফকির প্রমাণ করেছেন যে গ্রীক দার্শনিক কল্পিত ফিলজফার কিং এই পৃথিবী নামক উপগ্রহে ও মাঝে মাঝে দেবতার দূতরূপে দেখা দেন।

এ্যারিষ্টটল

এ্যারিষ্টটল

'শেষের কবিতা', পড়তে পড়তে হঠাৎ যদি সুনীতি চাটুজ্যের 'ভাষাতত্ত্বের ভূমিকায় আসতে হয় বা 'ছিন্নপত্র' শেষ করে যদি 'স্বদেশ ও সভ্যতা, আরম্ভ করতে হয় তবে মাথার অবস্থাটা কি রকম হয়? মনে প্রশ্ন জাগে যে রোমান্সের, স্বপ্নের মূল্য কতটুকু? 'শেষের কবিতা' বা 'ছিন্নপত্র' ঝাপসা থেকে ঝাপসাতর হতে থাকে। হয়ত' হঠাৎ চেঁচিয়েও উঠি, "মেয়েয়ালি সব ঝুট হায়!" প্লেটো থেকে এ্যারিষ্টটলে এসে পাঠকের অবস্থা ঠিক সেইরকমই হয়। পাঠক অবাক হয়, যেন আসা গেল অনেক ফাঁক দিয়ে—এ যেন প্লেনে দিল্লী যাওয়া, মাঝখানে কিছুই নেই; যেন একটা আকস্মিক অদ্ভুত পরিবর্তন—যেন ঘুম থেকে উঠে বলা

'বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর...।

'রিপাবলিকে' আমরা বেড়াচ্ছিলাম স্বপ্নরাজ্যে—রঙীন, মধুর স্বপ্ন সব; অত্যুদার আদর্শ সব আমাদের সম্মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আলেয়ার আলোর মত। এ্যারিষ্টটলের 'পলিটিক্সে' ভাবের রাজ্য হাওয়ায় মিলিয়ে গেল চকিতে; এবং এসে পড়লুম কঠিন বাস্তবের সামনাসামনি। প্লেটো বলেছেন যে আদর্শই চরম সত্য; সুতরাং আদর্শের জন্য তিনি সব কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত—'তোমরা যা বলো তাই বলো 'তাঁর' লাগেনা মনে।'

এ্যারিষ্টটল্ বললেন বাস্তব জগতের সত্য আরও বড় এবং এই আরও বড়র পিছনেই ছুটতে হবে। সুতরাং এ্যারিষ্টটল তার

'পলিটিক্স' আরম্ভ করলেন প্লেটোর রিপাবলিকের সমালোচনা দিয়ে, অর্থাৎ প্লেটোর আদর্শবাদকে বাস্তবের কষ্টিপাথরে ঘসে যাচাই করা নিয়েই সুরু হল এ্যারিষ্টটলের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার পরিচয়।

প্লেটো এসেছিলেন অভিজনদের মধ্য থেকে, তাই তাঁর ধ্যান-ধারণাও ছিল অভিজাত। এই অভিজনসুলভ ধ্যানধারণাই তাঁকে ব'লেছিল যে তাঁর রিপাবলিক শাসন করবে শাসকসম্প্রদায় বা অভিজনরা: সাধারণ নাগরিক করবে উৎপাদন—ব্যস্। জন-সাধারণের কর্মশক্তি ও চিন্তাপদ্ধতির উপর শ্রদ্ধা তাঁর ছিলনা মোটেই। ডেমোক্রেসী বা গণতন্ত্রকে তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নের মত 'রুল অফ্ দি ক্যাটল, বাই দি ক্যাটল এবং ফর দি ক্যাট্ল' না ব'ললেও তিনি জনমতকে সোজা 'ভারডিক্ট ওফ্ দি কেভ্' ব'লে তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। অভিজাতের ঐতিহ্য প্লেটোর চিন্তার পাকে পাকে জড়িয়ে ছিল তাই তাঁর 'রিপাবলিকে' আদর্শবাদের পটভূমিকার উপর অভিজনের গাঢ় রংয়ের তুলি গেছে বারবার।

সোজা ডেমস্ বা জনগণ বলতে আমরা যা বুঝি তা থেকে না আসলেও এ্যারিষ্টটল এসেছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এবং রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার প্রতি ছত্রে আছে মধ্যমের প্রতি অপার আকর্ষণ। এ্যারিষ্টোক্রেসী তাঁর ধাতে সয় না আবার সম্পূর্ণভাবে জনগণের সঙ্গে হাত মেলাতেও তিনি প্রস্তুত নন। এই জনগণ ও অভিজনদের চলার সমান্তরাল পথের মধ্যে আর একটি পথ বার করেছিলেন এ্যারিষ্টটল। এবং তাঁর সারা রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাযাত্রায় তিনি সেই পথ দিয়েই হেঁটে গেছেন।

অমর হবার পথের দাবী এ্যারিষ্টটলের আছে তিনটি: (১) তিনি ডিডাকটিভ্ লজিকের জন্মদাতা (২) তিনি রাষ্ট্রনীতির জন্মদাতা

(৩) তিনি স্কোলাসটিসিজমের জন্মদাতা। শেষেরটা নিয়ে হয়ত' তর্ক উঠতে পারে কিন্তু প্রথম দু'টো সম্বন্ধে মতভেদের কোন অবকাশই এ্যারিষ্টটল রেখে যান নি।

তৎকালীন প্রচলিত দার্শনিকের পোষাক-পরিচ্ছদ এ্যারিষ্টটল কখনও পরিধান করেন নি। চলন-বলন, কথাবার্তা আচার-ব্যবহার পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাবে-ভঙ্গীতে তিনি নিজেকে কখনও জনসাধারণ থেকে পৃথক করতে চেষ্টা করেন নি বরং তাদের মধ্যে মিশে যাবার চেষ্টাই করেছেন সারা জীবন ধরে। দার্শনিকের মত তাঁর এই মরজগতের সবকিছুর প্রতি একটা কৃপাপূর্ণ তাচ্ছিল্যের মনোভাবও ছিলনা। এদিক দিয়ে তিনি হলেন জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডেমোক্রেটীক।

সাধারণ এক চিকিৎসকের ছেলে। অনুমান যে ছেলেবেলায় এ্যানাটমিতে কিছু শিক্ষালাভ করেছিলেন কারণ তাঁর রাষ্ট্রনীতি-বিশ্লেষণে ব্যবচ্ছেদবিদ্যার পরিচয় বিশেষরকম পাওয়া যায়। বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে করে তোলে একজন অনন্যসাধারণ বিশ্লেষক। আইসোক্রেটীসের প্রভাব তাঁকে কাব্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্রের দিকেও টেনে নিয়ে যায় কিন্তু, তাঁর উপর প্লেটোর প্রভাবই হ'ল অপরিসীম।

প্লেটোর শিষ্যত্ব তাঁকে বাক্যাধ্যয়ন থেকে মানবাধ্যয়নে টেনে নিয়ে যায় অর্থাৎ কাব্যালঙ্কারের জগৎ পরিত্যাগ ক'রে তিনি গিয়ে পড়েন নীতিশাস্ত্র ও রাষ্ট্রনীতির আওতায়। প্লেটোর একা-ডেমীতে তিনি অধ্যয়ন করেন এবং আশা করেছিলেন যে প্লেটোর পর একাডেমীর কর্তৃত্ব আসবে তাঁরই হাতে; কিন্তু তা হ'ল না। কালজয়ী দার্শনিক প্লেটোও স্বজনপ্রীতি থেকে মুক্ত ছিলেন না। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর একাডেমীর কর্তৃত্ব এ্যারিষ্টটলের কাছে না

গিয়ে গেল তাঁর এক অখ্যাত ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে। মনের দুঃখে এথেন্স ছেড়ে এ্যারিষ্টটল চললেন—বনে নয়—'মরীচিকা অন্বেষণে।' অন্বেষণের পথে তিনি অনেক যায়গায় ঘুরেছেন, অনেক কিছু দেখেছেন এবং অনেক কিছু লিখেছেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এলেন ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপের কাছে। ফিলিপ তাঁকে নিযুক্ত করলেন তাঁর পুত্রের গৃহশিক্ষক। এই পুত্রই হ'লেন বিশ্ববিশ্রুত আলেকজেণ্ডার।

এ্যারিষ্টটলের সময়ে গ্রীক সিটি ষ্টেটগুলির অবস্থা হয়েছিল শোচনীয়। প্লেটোর সময়েই পেলোপনেসিয়ার সমর নগরী রাষ্ট্র-গুলির মধ্যে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছিল। নাগরিক আর রাষ্ট্র পদ-সেবাকেই চরম কর্তব্য ও পরম লক্ষ্য বলে কোনরকমেই জ্ঞান করতে পারছিল না; ব্যক্তি-স্বার্থের সঙ্গে রাষ্ট্র-স্বার্থের সংঘাত হচ্ছিল বারবার। এ্যারিষ্টটল যেন এসব দেখতেই পান নি। তিনি ছিলেন সিটি ষ্টেটের উপাসক; এই উপাসনার মন্ত্রই হ'ল তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের প্রথম ও শেষ কথা।

ছাত্র আলেকজেণ্ডারকে এ্যারিষ্টটল শেখাচ্ছিলেন যে নগরী-রাষ্ট্রই রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনের শেষ স্তর; এখানেই মানুষ তার রাষ্ট্রনৈতিক মোক্ষলাভ করবে—আর কোথাও নয়। সুতরাং একেই ফুলে, ফলে শোভিত কর, একেই সাজাও নূতন সজ্জায়—'এরি-তরে শুধু আজি রচ তবে গান...।' ছাত্রকে অন্যমনস্ক দেখে উপাসকের উচ্ছ্বাস পেল বাধা। 'কি ভাবছ বৎস...।'—একটু দুঃখিত হয়েই এ্যারিষ্টটল জিজ্ঞাসা করলেন। (তেড়ে ওঠা বোধহয় বিপজ্জনক ছিল; হয়ত ডায়োনিসসের কাছে প্লেটোর যে রকম অবস্থা হয়েছিল এ্যারিষ্টটলেরও সেইরকম অবস্থা হতে পারত।

তাই দুঃখিত বা কুপিত হলেও বৎস বলে সম্বোধন করে বাৎসল্য রসের প্রাবল্য দেখাতে হল)।

আলেকজেণ্ডার বললেন, ভাবছিলাম গুরু...যদি গুরু...সিটি ষ্টেটগুলো মিলে এক হয়...অর্থাৎ যদি...সমগ্র গ্রীস...এক হয়...।"

"তা হয় না সৌম্য! নগরী-রাষ্ট্রই রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনের শেষ অধ্যায়—একথা তোমাকে অনেকবার বলেছি...বোধ হয় তুমি মন দিয়ে শোননি।"

'মন দিয়েই শুনেছি গুরু; কিন্তু ও আমার কি রকম ভাল লাগে না...আমার মনে হয় যদি সমগ্র পৃথিবীটা একটা রাষ্ট্র হত... সমস্তটাই যদি আমার সাম্রাজ্য হত...তা হলে সমস্ত সংকীর্ণতা বিবাদ-বিসম্বাদ কোথায় চলে যেত......একদিন আমি বেরুব সমগ্র পৃথিবীকে একসূত্রে গাঁথতে......সেদিন ককেশাশের কান্না হিমালয়ের তুষারে গিয়ে প্রতিধ্বনি তুলবে...সাইবিরিয়ার গান ভেসে যাবে ইণ্ডিয়ায়...ম্যাসিডন ও ইণ্ডাস্ ভ্যালিতে হবে সম্পূর্ণ যোগসূত্র স্থাপন...কি অদ্ভুত! কি চমৎকার কল্পনা করতে লাগে বলুন ত! সমগ্র পৃথিবী এক—'দি ওয়ান ওয়ার্ল্ড।' আলেকজেণ্ডারের উচ্ছ্বাস থামলে পর এ্যারিষ্টটল আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে এলেন। মনের ক্লান্তিতে তাঁর মুখে কথা সরছিল না; তিনি ভাবছিলেন, এ কি করে সম্ভব হল?—'যেদিন ফুটল কমল

কিছুই জানি নাই

আমি ছিলেম অন্যমনে...'

এ্যারিষ্টটলকে বলা হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রবর্তক। তিনি ত' প্রথম রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক চিন্তা করেন নি। তাঁর আগে প্লেটোর মত মহারথী ছিলেন, ছিলেন স্মরণীয়ের সুপারলেটিভ সক্রেটীশ—তবুও কি করে এ্যারিষ্টটল হলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জন্মদাতা?

হ্যাঁঃ এ্যারিষ্টটলই হলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক। রাষ্ট্রনীতিকে তিনিই নীতিশাস্ত্রের কবল থেকে মুক্ত ক'রে রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রবর্ত্তনের পথে অনেকদূর এগিয়ে যান। তাঁর আগে পলিটিক্সকে এথিক্স থেকে আলাদা করে দেখবার চেষ্টা বিশেষ কেউ করেন নি। তাঁর পূর্ববর্ত্তীদের মতে নীতিশাস্ত্রই হল সর্ব্বগ্রাসী শাস্ত্র এবং রাষ্ট্রনীতি তারই একটা অংশ বা শাখা মাত্র ; অতএব মহীরুহের মূলে জল-সেচন করলেই শাখাপ্রশাখা আপনাথেকেই বৃদ্ধি লাভ করবে। রাষ্ট্রনীতি যে শাখা নয় এ্যারিষ্টটলই প্রথম সে কথা প্রমান করলেন।

এ্যারিষ্টটলের আগে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা-ফল বা ফুল ছিল এলোমেলো হ'য়ে ছড়িয়ে। এই ফুল কুড়িয়ে একসঙ্গে ক'রে মালা গেঁথেছিলেন এ্যারিষ্টটলই। যে ফুল শুকিয়ে গেছে, যে ফুল গন্ধহীন বা বর্ণহীন সেগুলোকে দিলেন বাদ। মালা গাঁথা হ'ল এবং এ্যারিষ্টটল পরিচিত হ'লেন প্রথম বিজ্ঞানী চিন্তাবীর বলে। তাঁর আগে অনেকেই এসেছেন, ক'রেছেন অনবদ্য অভিনয় কিন্তু এ্যারিষ্টটল রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়নি।

এ্যারিষ্টটল গ্রীক রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার অদ্ভুত সংক্ষেপকারক। শুধু সামারাইজার ব'লে অভিহিত ক'রে তাঁকে নোট মেকারদের দলে ফেললে অমার্জনীয় অপরাধ হবে। মৌলিক চিন্তাতেও তিনি তাঁর পূর্ববর্ত্তী বা পরবর্তী কারও চেয়ে কম নন। গ্রীক রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় যা কিছু সুন্দর বা যা কিছু গ্রহণযোগ্য এ্যারিষ্টটল তাঁর পলিটিক্সে তা গ্রহণ ক'রেছেন বেমালুম কিছুই উল্লেখ না করে ; কিন্তু যা গ্রহণযোগ্য নয়—যা অনুসন্ধিৎসু সমালোচকের তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ থেকে রেহাই পায় না তার তিনি ক'রেছেন তীব্র সমালোচনা। এবং সমালোচনার সময় ঐ চিন্তাবীরের নামোল্লেখ

করেছেন বারবার। এভাবে গাপ করার জন্য এ্যারিষ্টটলকে হ'য়ত পররচনাপহারক ব'লে দোষী করা যেতে পারে। দোষী করার সময় কিন্তু মনে রাখতে হবে যে পরভাব বা পররচনাপহরণ, ইংরেজীতে যাকে বলে প্লাজিয়ারিজম্, তখনকার দিনে এত' দোষের ছিল না। তার উপর তিনি যা গ্রহণ করেছেন তা তিনি চোখকান বুজে গ্রহণ করেন নি; গ্রহণ করবার আগে ভাল ক'রে যাচিয়ে দেখেছেন যে তা গ্রহণীয় কি না। তাঁর সমালোচনার কষ্টি-পাথরে যাচাই হয়ে কোন ভাব গ্রহণযোগ্য ব'লে পাশ মার্ক পেলেই গৃহীত হয়নি; যতক্ষণ না সেই ভাবধারণা তাঁর সিস্‌টেমে খাপ খেয়েছে ততক্ষণ তা হ'য়েছে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত। সুতরাং গ্রীক্ রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় গ্রহণযোগ্য যা কিছু তার পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ পাওয়া যাবে এ্যারিষ্টটলের 'পলিটিক্সে'।

এ্যারিষ্টটলের পলিটিক্সে আমরা যে কেবল প্লেটোর 'রিপাবলিকে'র মহান আদর্শ বা অপূর্ব নীতিবাদের অভাব বোধ করি তা নয়; অভাব বোধ করি আরও অনেক কিছুর: অশেষ শৃঙ্খলাপূর্ণ ভাবধারার গতির, কাব্যময় যাত্রার। অশ্রুত সঙ্গীতের শেষ হ'য়ে হঠাৎ যেন গদ্যময় জীবন আরম্ভ হ'ল। যে সোনার তরীতে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়েছিলাম তা যেন কোন চোরা-পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে আমাদের সহসা ক'রে তুলেছে সচেতন। সত্যই এ্যারিষ্টটলের 'পলিটিক্স' অতিমাত্রায় প্রোজেইক।

'পলিটিক্স' একখানি সম্পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ নয়। এ্যারিষ্টটলের রাষ্ট্র-নীতি-চিন্তা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেচে টুকরো টুকরো অসমাপ্ত অবস্থায় এবং অনেকস্থলে পরিবর্তিত রূপেও। এই অসমাপ্তি ও পরিবর্তনের মাঝে মাঝে আবার মধ্যযুগের ভাষ্যকারদের নিজেদের

বুকনি আছে। ফলে 'পলিটিক্স' ব'লে যে গ্রন্থখানা আমরা হাতে পাই তাকে একরকম জগাখিচুড়ি বলা চলে। পরিবর্তনের স্রোত-ধারা এ্যারিষ্টটলের মৌলিকত্বকে কোথায় কি ভাবে আক্রমণ ক'রেছে তা বিচার ক'রতে পণ্ডিতগণকে পাইপের গোড়া কামড়ে ঘন ঘন পদচারণা ক'রতে হয়!

সম্ভবতঃ এ্যারিষ্টটল বক্তৃতাই দিয়েছিলেন, নিজে লেখেন নি এবং ছাত্ররা নোট নিয়েছে। নোট নেবার সময় তারা বোধহয় নেট বক্তব্যের দিকেই বেশী লক্ষ্য রেখেছিল। নেট বক্তব্যের এই সমস্ত নোট তারপর গেছে গ্রন্থাকারে ভাষ্যকারদের হাতে। ভাষ্যকারেরা টীকাটিপ্পনি করবার সময় নিজের দু'চার লাইন এ্যারিষ্টটলের ব'লে চালিয়ে দেবার লোভ সামলাতে পারেন নি—যেমন বিদ্যাপতির পদাবলীতে অনেক অবিদ্যাপতি নিজেদের কাব্যপ্রতিভার পরিচয় দেবার প্রয়াসে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রেছেন। ফলে 'পলিটিক্স' হয়েছে এক অদ্ভুত গ্রন্থ—একজনের যে লেখা তা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। লোকোত্তর প্রতিভার স্পর্শও আছে অধিকাংশ ছত্রে আবার তৃতীয় শ্রেণীর কেরামতির প্রাণান্ত প্রচেষ্টাও নজরে পড়ে—যেন ইংলিশ ইণ্টারন্যাশান্যালের ছ'জন খেলোয়াড়ের সঙ্গে ক'লকাতা অফিস লীগের কোন বাজে মার্কা টীমের পাঁচজন খেলোয়াড় নিয়ে এক ফুটবল টীম গঠিত হয়েছে। অপূর্ব কেরামতির সঙ্গে ইণ্টার-ন্যাশান্যালের সেণ্টার ফরোয়ার্ড যখন গোল করে তখন দর্শকেরা নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে আবার অফিস লীগের টীমের ব্যাক যখন অকারণ (!) সেমসাইডে গোল করে তখন চক্ষু করে বিস্ফারিত। এত 'দোষ' সত্ত্বেও এ্যারিষ্টটলের 'পলিটিক্সই' হলো মধ্যযুগের ফিলজফিক্ বাইবেল এবং প্রাচীনকালের যে কোন দার্শনিকের চেয়ে সাম্প্রতিক সংস্কৃতিকে এ্যারিষ্টটলই করেছেন বিশেষ প্রভাবান্বিত।

পলিটিক্সে এ্যারিষ্টটল তাঁর রীতি অনুযায়ী কোনরকম গৌর-চন্দ্রিকার অবতারণা না করে সোজা বিষয়বস্তুর মধ্যে গিয়ে পড়েছেন। বাস্তববাদী দার্শনিক তিনি, থিওরেটিসিয়ান নন তাই প্লেটোর মতন আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি করতে গিয়ে আদর্শ রাষ্ট্র-গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নি।

এ্যারিষ্টটলের বাস্তববাদের সঙ্গে আবার বিশেষ ভাবে মিশেছে রক্ষণশীলতা। তাঁর পলিটিক্সের উদ্দেশ্যই হ'ল রক্ষা করা—প্রচলিত নিয়ম, প্রচলিত ব্যবস্থা ও প্রচলিত মতকে। গ্রীস ক্রীত-দাস প্রথাকে তিনি সমর্থন করেছেন প্রবল অনুরাগের সঙ্গে; স্ত্রীলোক সম্বন্ধে গতানুগতিক গ্রীক অভিমত সমর্থন করে পাতার পর পাতায় সমস্ত যুক্তিপূর্ণ তথ্য পরিবেষণ করেছেন; রাষ্ট্র যে অকৃত্রিম এবং অবশ্যম্ভাবী তা বুঝিয়েছেন; এবং পারিবারিক জীবন নষ্ট করলে যে রাষ্ট্রের ভিত্তি একেবারে আলগা করে দেওয়া হবে তাও দেখিয়ে দিয়েছেন সূর্যের আলোর মত প্রত্যক্ষভাবে। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে রাষ্ট্রদেহে ব্যাধির উৎপত্তি কোথায় এবং সেই সমস্ত ব্যাধি নিরাময় করতে হ'লে কি কি ঔষধি প্রয়োগ করতে হবে সে নির্দেশও দিয়ে গেছেন।

বলা যায় যে প্লেটোর কল্পনাকে বাস্তববাদের আবেষ্টনীর মধ্যে আনার জন্য এ্যারিষ্টটল করেছিলেন অনন্যসাধারণ চেষ্টা। প্রচলিত অনেক কিছুর ঐশ্বরিক অধিকার বা ডিভাইন রাইট এ্যারিষ্টটলের মনকে নাড়া দিয়েছিল অদ্ভুতভাবে কিন্তু যে কোন প্রচলিত ব্যবস্থাই এ্যারিষ্টটলের মনে দাগ কাটতে পারেনি। সেই প্রচলিত ব্যবস্থাই গৃহীত হয়েছিল যাকে তিনি বিচারবুদ্ধি দিয়ে সমর্থন ক'রতে পেরে ছিলেন; অর্থাৎ চললেই হ'লনা যেরকম ভাবে চলা উচিত সেই রকম ভাবে চললে তবেই এ্যারিষ্টটলের সমর্থন পেয়েছে—তার আগে নয়।

রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় তিনি গ্রীসের আবেষ্টনীর বাইরে যান নি কিন্তু গ্রীসের জীবনচর্যা থেকে লব্ধ-অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অনেক আন্তর্জাতিক নিয়মের প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। ধ্যানধারণায় নিজে গ্রীসের বাইরে না গেলেও গ্রীসের অনেক ধ্যানধারণাকে তিনি য়ুনিভার্সালাইজ্‌ড্‌ করেছিলেন।

এ্যারিষ্টটল ছিলেন চরমকারক বিজ্ঞান বা টেলিওলজির পক্ষপাতী। পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁর ধারণা টেলিওলজিক্যাল: সমস্ত স্থানেই সকল কিছুই পরিণতির উদ্দেশ্যে চলে অর্থাৎ পরিণতিই নিজের পথ প্রস্তুত করে নেয়। এই উদ্দেশ্যবাদ থেকেই এ্যারিষ্টটল বললেন যে প্রকৃতির প্রত্যেক বিষয়ে এক একটা অভিপ্রায় আছে; এই অভিপ্রায় অনুসারেই উদ্ভিদ ও জীবজগতের সমস্ত কিছু চলে। মানুষ ছাড়াও অন্যান্য জীব জন্মগ্রহণ করে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বংশ রক্ষা করে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই অতিসাধারণ সরল কাঠামোর মধ্যে 'সুখের' স্থান নেই; প্রকৃতির ইচ্ছাই নয় যে অন্যান্য জীব সুখভোগ করে। মানুষের বেলা কিন্তু স্বতন্ত্র কথা—'ম্যান ইজ্‌ ইনটেন্‌ডেড্‌ ফর হ্যাপিনেস্‌', বললেন এ্যারিষ্টটল। এবং এই হ্যাপিনেসের জন্যই রাষ্ট্রীয় সমাজ। রাষ্ট্রীয় সমাজের বাইরে সে জৈবধর্ম পালন করতে পারে কিন্তু মানবধর্ম পালন করতে পারে না এবং মানবধর্ম পালনে অপারগ হলে হ্যাপিনেসের সঙ্গে মোলাকাৎও অসম্ভব।

এ্যারিষ্টটলের মতে আর্ট হল প্রকৃতির অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করা, প্রকৃতিকে অনুসরণ করাও বটে। মানুষকে সুখী করতে প্রকৃতি পারে না—এখানেই সে অসম্পূর্ণ, এখানেই তার ত্রুটি, এখানেই তার অসার্থকতা; কিন্তু প্রকৃতির এই ত্রুটির মধ্যেই তার র'য়েছে মানুষের সুযোগ। এই ত্রুটির জন্যই সোজা হ'য়ে দাঁড়াল মানুষ প্রকৃতির

অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করতে। পরস্পরের সমবায়ে যে গ'ড়লে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ যেখানে সে হ'তে পারে সুখী। সে সৃষ্টি করলে আর্টের, হ'ল আর্টিষ্ট।

রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের বাইরে মানুষের কোন অস্তিত্বই নেই, জীবন তার সম্পূর্ণ নিরর্থক কারণ রাষ্ট্রীয় সমাজের বাইরে অর্থাৎ একক অবস্থায় তার জীবন আর পশুর জীবন হ'য়ে গেছে একাকার। পরিবার বা দল মানুষের নৈতিক জীবন যাপনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। কেবলমাত্র রাষ্ট্রের অধিবাসী হ'য়েই সে নিজের সত্ত্বা খুঁজে পায়—নিজেকে যে ভাবে গড়া সম্ভব সেই ভাবে গ'ড়তে পারে। তাই এ্যারিষ্টটল ব'ললেন যে প্রকৃতি অনুসারেই মানুষ রাষ্ট্রনৈতিক জীব।

প্রকৃতি অনুসারেই মানুষ যখন সমাজবদ্ধ জীব এবং রাষ্ট্রের অধীনে থাকে তখন রাষ্ট্রও প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট ও অবশ্যম্ভাবী। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিবর্তন মতবাদই এ্যারিষ্টটল গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্র, তাঁর মতে, কৃত্রিম নয় সুতরাং শক্তিপ্রয়োগে বা সামাজিক চুক্তিদ্বারা এর সৃষ্টি হয়নি; রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে মানুষের প্রয়োজনে নিজস্ব বিবর্তনধারার প্রতি স্তরে রূপে সজ্জিত হ'য়ে, রসে সঞ্জীবিত হ'য়ে। বন্য পশুর মত মানুষ একক জীবন যাপন করতে পারেনা, তাই সে ক'রলে বিভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপন—পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি; গ'ড়ে উঠল পারিবারিক জীবন। পরিবারগুলো হ'তে লাগল দলবদ্ধ; সৃষ্টি হ'ল দলগত জীবনের—বিবর্তনধারার পলিমাটিতে পড়ল আর একটি স্তর। দলের পুষ্টি হ'য়ে সৃষ্টি হ'ল রাষ্ট্রের—মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন-পথের চরম ইতিহাসের অধ্যায় লেখা হল সুরু। হ'ল উপনিবেশ স্থাপন, এবার জঙ্গল কাটিয়ে, তাঁবু খাটিয়ে—বসবাস সুরু কর।

তারপর......

এ্যারিষ্টটল বিশ্বাস করতেন যে যে কোন শাসনপদ্ধতিতে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের রূপকে প্রতিফলিত দেখতে পাওয়া যাবে। তাঁর মতে রাষ্ট্র ও শাসনতন্ত্রের মধ্যে হল জীবনমরণ সম্বন্ধ; রাষ্ট্র যেন শাসনতন্ত্রের জীবনসঙ্গিনী ও সহধর্মিণী। কন্‌ষ্টিটিউশন পরিবর্তিত হ'লে ষ্টেটও পরিবর্তিত হয় এবং কন্‌ষ্টিটিউশনের মৃত্যু ঘটলে তার সঙ্গে রাষ্ট্রকেও যেতে হয় সহমরণে। সুতরাং যে কোন সফল বিপ্লবে রাষ্ট্রেরও জীবনাবসান ঘটে এবং জন্মগ্রহণ করে অপর এক রাষ্ট্র; এ রেশারেক্‌শন নয়—মৃত রাষ্ট্রেরই পুর্ণজীবন লাভ ঘটেনা, জন্মগ্রহণ করে এক নবরাষ্ট্র।

এ্যারিষ্টটলের এই সহমরণ-ধর্মে ও জীবন-মরণ সম্বন্ধে সাম্প্রতিক রাষ্ট্রনৈতিক দার্শনিকদের মোটেই শ্রদ্ধা নেই। এবং তাঁরা রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন থেকে এইরূপ সতীদাহ প্রথার বিলোপের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। এই আধুনিক বেন্টিঙ্কেরা বলেন যে রাষ্ট্র চিরস্থায়ী—অবিনশ্বর। সরকার বিলুপ্তির অন্তরালে যেতে পারে, শাসনতন্ত্র ভেঙ্গে পড়তে পারে বারবার কিন্তু রাষ্ট্র যাকে বলে অচল, অটল। ফরাসী দেশে ত' বারবার শাসন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু তাই বলে কি ফ্রেঞ্চ ষ্টেটের অস্তিত্বের বিলোপ হয়েছিল কখনও? ওয়েমার কন্‌ষ্টিটিউসনের সঙ্গে সঙ্গে কি জার্ম্মান রাষ্ট্রও শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছিলো? না! কারণ রাষ্ট্র শাশ্বত; শাসনপদ্ধতির পরিবর্তনেই রাষ্ট্রের পরিবর্তন বা মৃত্যু হয় না:...'

'মেঘেতে যা কিছু আঁকিয়া যাক
আকাশে কখনও লাগেনা দাগ...'

বুঝিলেন?

বুঝলাম যে রাষ্ট্রের মৃত্যু সম্বন্ধে বেন্টিঙ্করাই ঠিক—দার্শনিক-শিরোমণি এ্যারিষ্টটল নন।

রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগও এ্যারিষ্টটলের 'পলিটিক্সের' এক অপূর্ব অধ্যায়। এই শ্রেণীবিভাগ বিষয়ে তাঁর গুরুদেবকে তিনি অনুসরণ করলেও তিনিই, প্লেটো নন, এ বিষয়ে শেষ কথা বলেছেন বলা যায়। প্লেটোর শ্রেণীবিভাগ কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি—পেরেছে এ্যারিষ্টটলের।

শ্রেণীবিভাগে এ্যারিষ্টটল দু'টি তত্ত্বের অনুসরণ করেছেন: ১। নৈতিক। ২। সংখ্যাত্মক। নীতিতত্ত্ব অনুসারে দেখতে হবে যে রাষ্ট্রের আদর্শ কি—সমগ্র জনসাধারণের না স্বল্প কয়েকজনের মঙ্গল? রাষ্ট্রের অস্তিত্বই, এ্যারিষ্টটলের মতে, মঙ্গলময় জীবনধারণের সহায়করূপে—দি ষ্টেট্ একজিস্‌টিস্ টু প্রোমোট গুড্ লাইফ! এখন দেখতে হবে যে কার গুড্ লাইফ সে প্রমোট করছে—সকলের না স্বল্প কয়েকজনের? যদি রাষ্ট্রের মঙ্গলপ্রভাব সকলকেই স্পর্শ করে তবে সে রাষ্ট্রের নির্মলতা নষ্ট হয়নি বুঝতে হবে কিন্তু যদি তার হস্ত নিয়োজিত থাকে মাত্র কোন বিশেষ শ্রেণীর মঙ্গলবিধানে তবে সে রাষ্ট্র হ'য়েছে বিকৃত—এও বুঝতে হবে।

সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে বিচারের সময় দেখতে হবে যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাদের হাতে? যদি ক্ষমতা একজনের হাতে থাকে তবে বলা হবে রাজতন্ত্র, কয়েকজনের হাতে থাকলে তাকে অভিজাততন্ত্র বলে অভিহিত করা হবে এবং সকলের হাতে থাকলে আখ্যা পাবে গণতন্ত্র বা পলিটি।

নির্জলা এই তিন তন্ত্রের বিকৃতরূপের নামও এ্যারিষ্টটল দিয়েছেন। রাজতন্ত্র বিকৃত হলে হবে স্বেচ্ছাচারতন্ত্র; অভিজাত-তন্ত্র বিকৃত হলে সংকীর্ণতন্ত্র বা অলিগার্কিতে পরিণত হবে, এবং গণতন্ত্র বা

পলিটি যদি বিকৃত হয় তবে তাকে বলা হবে ডেমোক্রেসী বা জনশাসন। বর্তমানে আমরা রাজতন্ত্র, স্বেচ্ছাচারতন্ত্র, সংকীর্ণতন্ত্র ও লাঠিতন্ত্রের মধ্যে কোনই পার্থক্য করি না; ডেমোক্রেসীকে বলি গণতন্ত্র বা 'রুল ওফ্ দি পিপ্‌ল্।' রুল বলতে কিন্তু বুঝি প্রতি কয়েকবছর অন্তর এক একবার ব্যালট বক্সের সান্নিধ্যে আসা এবং প্রকৃত রুল যখন চলতে থাকে তখন সংবাদপত্রে পাঠাস্তে হাত-পা ছোঁড়া। রুল বা শাসন বলতে এ্যারিষ্টটল কিন্তু বুঝতেন আইন প্রণয়নে, আইন প্রবর্তনে ও বিচার ব্যবস্থায় পূর্ণভাবে যোগদান— শুধু প্রতিনিধি প্রেরণ নয়। তাই তিনি সকলের শাসনকে ভয় করে এসেছেন এবং রুল ওফ্ দি পিপল্‌কে নাম দিয়েছেন ডেমো-ক্রেসী বা জনশাসন। বর্তমানে আমরা লাঠিতন্ত্রকে যেরকম ঘৃণা করি জনতন্ত্র বা জনশাসনকে এ্যারিষ্টটল করতেন সেইরকম ঘৃণা। সকলকে শাসন করতে বলার অর্থ তাঁর মতে হ'ল সর্বনাশের বেসাতি করা।

আদর্শ শাসনতন্ত্র কি? এ্যারিষ্টটলের মতে আদর্শ শাসনতন্ত্র হ'ল রাজতন্ত্র—রাজা কিন্তু সর্বগুণসমন্বিত হওয়া চাই; অর্থাৎ সেই রাজ্যই রাম রাজ্য রাম যেখানে রাজা। এই ধরণের রাজতন্ত্রের পিছুপিছু রেসের ক্লোজ্ সেকেণ্ড ঘোড়ার মত ধাওয়া করেছে অভিজাততন্ত্র। কিন্তু যাই ভাল তাই যে সম্ভব হবে তার কি কোন মানে আছে? সুসম্পন্ন রাজা বা অভিজাতের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন এবং ফলে আদর্শ রাজতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্রের সম্ভাবনা অতিমাত্রায় অল্প। গড়পড়তায় বিচার করলে পলিটিকেই বেশী নম্বর দিতে হবে—তাই স্বর্ণ সমক বা গোল্ডেন মীন অনুসারে পলিটিই হল এ্যারিষ্টটলের আদর্শ-শাসনতন্ত্র।

বিপ্লব সম্বন্ধেও এ্যারিষ্টটল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। এ

সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্তই বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কালের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ। ইতিহাসের নজির দিয়ে বিচার ক'রে তবেই তিনি বিপ্লব সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

বিপ্লব তাঁর মতে আনে শাসনতন্ত্রের প্রকৃত পরিবর্তন। রাষ্ট্রনৈতিক অনেক পরিবর্তনই বিপ্লবের দ্বারা সংঘটিত হয় কিন্তু প্রকৃত বিপ্লব ঘটায় শাসনতন্ত্রে প্রকৃত পরিবর্তন।

বিপ্লব ঘটে কেন? বিপ্লব তখনই ঘটে যখন কোন শ্রেণী মনে করে তাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে—অর্থাৎ শ্রেণীগত বৈষম্যের ফলে যে অন্যায় জন্মগ্রহণ করে সেই অন্যায়ই করে বিপ্লবের পথ পরিষ্কার। এই যে বৈষম্য একে আপেক্ষিক অর্থে ধরতে হবে। ধনী ও নির্ধনের মধ্যে বৈষম্য থাকবেই রাষ্ট্রনৈতিক বিশেষাধিকার বা প্রিভিলেজ্ নিয়ে। এই ধরণের বৈষম্য হল সমানুপাতিক বৈষম্য। এ বৈষম্য যাবে বিশেষ ভাবে নাড়া দিলেও বিপ্লব সাড়া দেয় না। বিপ্লব তখনই আসে দ্রুত অশ্বারোহণে যখন কোন শ্রেণীর প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে হয় বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি। ন্যায়ের ব্যর্থ প্রয়াস মানুষকে করে তোলে রেভোলিউসনারি।

অনেক সময় তুচ্ছ কারণেও বিপ্লবের সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু তার আগে উপাদান চাই প্রস্তুত—ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকেও দাবানলের সৃষ্টি হতে পারে—কিন্তু তার আগে চাই অরণ্যানীর প্রস্তুতি নিবিড়ভাবে দাবানলের কণ্ঠালিঙ্গন করবার জন্য।

বিপ্লবের প্রতিকার কি? প্রতিকার অতি সোজা। বিপ্লবের কারণ দূর ক'রে তাকে আসতে বারণ কর—তবেই সে তোমার বারণ শুনবে—নচেৎ নয়। প্রিভেন্‌সন্‌ই একমাত্র রেমিডি এ্যারিষ্টটলের মতে।

অলিগার্কি ও ডেমোক্রেসীর পরিবেশেই তিনি বিপ্লবকে নিয়ে

বেশী সময় মাথা ঘামিয়েছেন এবং স্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন। স্বেচ্ছাচারতন্ত্র বা টির‍্যানির সঙ্গে যখনই তিনি বিপ্লবকে জড়িয়ে ফেলেছেন তখনই কিন্তু স্পষ্ট উত্তর দিতে কতকটা কিন্তু কিন্তু ক'রেছেন। মোট কথা স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে তিনি বিপ্লবকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছেন। স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে বিপ্লব দূর করতে তিনি দু'টো সম্পূর্ণ আলাদা পথ বাতলে দিয়েছেন: ১। প্রথম অনুরঞ্জন বা কন্‌সিলিয়েসন্ নীতি পরীক্ষা করে দেখতে বলেছেন। এতে যদি কোন ফল না হয় তবে সোজা ২। দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ কর'তে উপদেশ দিয়েছেন। সাম্প্রতিক চিন্তাশীলরা অবাক হন যে স্বেচ্ছাচারীর সংশ্রবে এসে পণ্ডিতপ্রবরের এত পরিবর্তনের কারণ কি?

রক্ষণশীল দার্শনিক হ'লেন এ্যারিষ্টটল। পারিবারিক জীবন, স্ত্রীলোক ও ক্রীতদাস সম্বন্ধে তিনি গ্রীক ঐতিহ্যের প্রতি সম্ভাষ্যরূপে শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। পারিবারিক জীবন তাঁর মতে একটা পবিত্র কর্তব্য; একে নষ্ট করা মানে হল কর্তব্যচ্যুত হওয়া—পাপের পথেই অগ্রসর হওয়া। সুতরাং প্লেটোর মতবাদ যে আদর্শ রাষ্ট্রে স্ত্রীলোকের উপর সমানাধিকার থাকবে—এক কথায় যাকে বলে কম্যুনিটি ওফ্ ওয়াইভ্‌সের থিওরি তা এ্যারিষ্টটলের সমালোচনার দৃষ্টির সম্মুখে প্রশ্রয় ত' পায়ইনি উপরন্তু পেয়েছে কঠিনতম আঘাত।

স্ত্রীলোক তাঁর মতে পুরুষের সমকক্ষ হ'তেই পারে না সুতরাং পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীলোকের সমানাধিকারবাদ এ্যারিষ্টটলের মতে হ'ল কথার কথা, ভাবের কথা আদর্শের কথা—বাস্তবতার কথা নয়। স্ত্রীলোকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হল সন্তান প্রসব ও সন্তান পালন। বিদ্যাশিক্ষা? হাঁ: প্রয়োজন—সন্তান পালনার্থে যতটুকু

প্রয়োজন ততটুকুই।—এর বাইরে নারীর বিদ্যাশিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। সাংসারিক বিষয়ে স্বামী ইচ্ছে করলে স্ত্রীর মতামত গ্রহণ করতে পারে কিন্তু মতামত কার্যকরী হবে স্বামীরই—স্ত্রীর নয়। প্রকৃতপক্ষে এ্যারিষ্টটল স্ত্রীলোকদের জন্য সাবর্ডিনেট কো-অপরেশন বা অধীনতামূলক সহযোগিতার স্থান দান ক'রে গেছেন। এবং প্লেটোর শিষ্য হ'লেও তিনি হ'লেন জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ্যান্টিফেমিনিষ্ট। প্লেটোর একতারায় অশ্রুত সাম্যের গান ছাপিয়েও এ্যারিষ্টটলের কণ্ঠ শোনা গেল—নারী! তোমার স্থান হেঁসেলে, আঁতুড়ঘরে; এই হ'ল তোমার গণ্ডী, এর বাইরে পা বাড়িও না। বাড়ালে এক নূতন রামায়ণের সৃষ্টি হবে—তোমার হবে রক্ষপুরীতে বাস, হবে আর এক অগ্নিকাণ্ড—সোনার এথেন্স, সোনার গ্রীস দাহনে হবে ছারখার সুতরাং সাবধান!

• প্রাচীন গ্রীসে ক্রীতদাস প্রথা অনেকদিন ধরে চ'লে আসছিল এবং অনেকানেক চিন্তাবীর এই প্রথার সমর্থন করেছিলেন। প্রাচীন গ্রীসের ধনোৎপাদনে ক্রীতদাসদের দান অপরিমেয়। নাগরিকগণ যখন নাগরিকের কর্তব্যসাধনে ব্যস্ত তখন তাদের রসদ জোগাবার ভার গ্রহণ ক'রেছিল ক্রীতদাস সম্প্রদায়। রসদই রাষ্ট্রনীতির গোড়ার কথা—ফুড্ ইজ্ পলিটিক্স। সুতরাং বলা যায় যে গ্রীক সভ্যতা এবং গ্রীক রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি ছিল ক্রীতদাস সম্প্রদায়। ক্রীতদাস প্রথা না থাকলে গ্রীকসভ্যতা সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপ ধারণ ক'রত। 'নতশির মূকসবে' ক্রীতদাস সম্প্রদায় ক'রেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে গ্রীক সভ্যতাকে লালন পালন।

এই ক্রীতদাস সম্প্রদায় ছিল অনেকটা আমাদের আর্য বর্ণাশ্রমের শূদ্র বা দাস সম্প্রদায়ের মত। সোফিষ্টরা এই ক্রীতদাস প্রথাকে তীব্রভাবে নিন্দা করেছিলেন। বহু শতাব্দী পরে দার্শনিক টম

পেন বলেছেন যে মানুষে মানুষে তফাৎ হয় কেবল ভাল ও মন্দের দ্বারা। একথা সোফিষ্টদের কথারই পুনরুক্তি মাত্র। প্লেটোর মত যে সকল মানুষকেই একই বিশ্বকর্মা একই কাদা দিয়ে গ'ড়েছেন, সুতরাং ক্রীতদাস ও প্রভুর মধ্যে পার্থক্য থাকা শুধু অশোভন নয়, অন্যায়ও বটে।

এ্যারিষ্টটল বললেন মোটেই অন্যায় নয়—এই ক্রীতদাস প্রথার ভিত্তির উপরেই দাঁড়িয়ে আছে, 'অভিজাত'মূলক শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি—সুতরাং একে বাঁচিয়ে রাখ শত প্রচেষ্টার দ্বারা। (এ্যারিষ্টটলের আভিজাত্য আপেক্ষিক অর্থে ধ'রতে হবে।)

ক্রীতদাসের বিশেষ বিচারশক্তি নেই বা বিচারশক্তি একেবারেই নেই—অজ্ঞানতাই তার বৈশিষ্ট্য। এই জ্ঞানহীনতা ও বিচারশক্তির অভাবের ফলেই সে ক'রবে তার প্রভুকে অনুসরণ অন্ধভাবে। এতে তার নিজের উপকার প্রভুর উপকারের চেয়ে কোন অংশে কম হবে না। দেহ যেমন মনের অধীন তেমনি ক্রীতদাসের পক্ষে সর্বতোভাবে প্রভুর অধীন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এইজন্য বিচারবুদ্ধি হীন অজ্ঞান ব্যক্তিরা হবে ক্রীতদাস—এতে তার নিজের মঙ্গল, প্রভুর মঙ্গল এবং রাষ্ট্রের মঙ্গল। এই মঙ্গল কিউবের উপর এ্যারিষ্টটল তাঁর ক্রীতদাসপ্রথার প্রতি গভীর অনুরাগমূলক সমর্থনকে খাড়া ক'রেছেন।

এ্যারিষ্টটল স্বাভাবিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করার ঘোরতর বিরুদ্ধে কারণ এই ধরণের দাসত্ব তাঁর মতে অস্বাভাবিক। স্ত্রীলোককেও শৃঙ্খল পরানো যাবেনা এ্যারিষ্টটলের মতে কারণ প্রকৃতি স্ত্রীলোকের কাজ নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছে—সন্তান প্রসব ও সন্তান পালন। এ্যারিষ্টটলের ক্রীতদাস প্রথায় দাসেরই স্থান আছে, দাসীর স্থান নেই।

যুদ্ধে বন্দীদেরও ক্রীতদাস করা উচিত নয় কারণ বন্দীদের মধ্যেও অনেক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি থাকতে পারে; কিন্তু বন্দীরা যদি বর্বর হয় (প্রচলিত গ্রীক মতে এ্যারিষ্টটলও সায় দিয়েছিলেন যে উপনিবেশের সমস্ত অধিবাসী এবং অধিকাংশ অ-গ্রীক বর্বর) তবে তাদের ক্রীতদাস করার পক্ষে কোন বাধা নেই কারণ বর্বররা প্রজ্ঞাবিহীন।

আমাদের কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এ্যারিষ্টটলের এই দাসত্বপ্রথার সমান্তরালের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্রে নির্দেশ আছে যে কোন আর্যকে কখনও দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা উচিত নয়।

দাসত্বপ্রথার সপক্ষে এ্যারিষ্টটলের এই ওকালতি সমালোচনার সমক্ষে মোটেই দাঁড়াতে পারেনা। কতক লোক ক্রীতদাস হবার জন্যই প্রকৃতি কর্তৃক নির্দিষ্ট হ'য়েছে এটা ভাবতেই সভ্য মানুষের বিষবৎ লাগে। সাদৃশবোধক প্রমাণ বা এনালজির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে এ্যারিষ্টটল দাসত্বপ্রথার সপক্ষে সপ্তম সুরে গুণগান ক'রে গেছেন কিন্তু সাদৃশ্যও সমতায় যে অনেক তফাৎ তা দার্শনিক চূড়ামণি বেমালুম ভুলে বসে আছেন। তা ছাড়া বর্বররা যে সকল সময়েই প্রজ্ঞাবিহীন হবে তার নিশ্চয়তা কি? তিনি নিজের স্বীকার ক'রেছেন যে অনেক সময় ক্রীতদাসদের মধ্যেও জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। যদি পাওয়াই যায় তবে শিক্ষার পালিশ চালিয়ে এই জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধিকে জনসমাজে আরও পরিচিত করা যেতে পারে। এবং তা হ'লেই তারা প্রতিব্যক্তির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারবে।

ভাঙ্গা কাঠের পায়ার উপর ভারী পাথরের চাবড়া বসিয়ে এ্যারিষ্টটল তাঁর দাসত্ব প্রথার মঞ্চ তৈরী ক'রতে গিয়েছিলেন। কাঠের পায়া ভার রাখতে পারলে না।

জন্ম মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে হওয়ার জন্যই বোধহয় এ্যারিষ্টটলের স্বভাবতঃই মধ্যমের প্রতি একটা অপার আকর্ষণ জন্মেছিল। কোন বিষয়েই তিনি চরম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'তে পারেন নি বা চান নি। সকল সময়েই মাঝপথ দিয়ে হেঁটে গেছেন। তাঁর মতে মাঝ পথ দিয়ে হাঁটাই বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ। এবং এজন্য উপদেশও দিয়েছেন রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় সকল সময়ে মাঝপথ দিয়ে হাঁটতে। আদর্শ রাষ্ট্র গঠনোদ্দেশে প্লেটো এমন চরম সীমায় উপনীত হ'য়েছিলেন যে সেক্স রিলেসন বিষয়েও বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রতেও ভয় পান নি। এ্যারিষ্টটল ব'ললেন যে সমীচীনতার বসবাস মাঝপথেই; সুতরাং একেবারে প্রান্তে যাওয়া ভুল—চরমতাকে গ্রহণ করা মূর্খতা। এই স্বর্ণ-সমকবাদ বা গোল্ডেন মীনের উপরই তিনি তাঁর সমস্ত সিদ্ধান্ত খাড়া ক'রেছেন।

এই স্বর্ণ-মধ্যকের জন্যই কম্যুনিজম তাঁর কাছে মূঢ়তা ব'লে মনে হ'য়েছে। 'অতদুর এক্সট্রীমিষ্ট হওয়া গুরুদেবের পক্ষে মোটেই যুক্তিযুক্ত হয়নি', ব'ললেন এ্যারিষ্টটল। বেশী এগুতে গিয়ে প্লেটো আবার পথে অনেক ফাঁক রেখে গেছেন; সাম্যবাদের ইমারত বেশী উঁচু ক'রতে গিয়ে বুনিয়াদ ও গাঁথনি প্লেঠো ক'রে ফেলেছেন অতি কাঁচা, অতি নড়বড়ে। অতএব একটু নাড়া দিলেই ভেঙ্গে পড়বার সম্ভাবনা। নাড়া দিয়েছেন এ্যারিষ্টটল নিজেই এবং প্লেটোর সাম্যবাদ হ'য়েছে ধূলিধূসরিত তাঁর শিষ্যপ্রবরেব হাতে।

রাষ্ট্রের মধ্যে থিওরি অফ্ ইউনিটির উপর প্লেটো তাঁর কম্যুনিজকে খাড়া ক'রেছেন। এ্যারিষ্টটলের মতে প্লেটো ঐক্যবাদকে এতদুর ঠেলে নিয়ে গেছেন যেখানে তার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। স্বর্ণ সমক অনুসারে এ্যারিষ্টটল বলেন যে রাষ্ট্রের মধ্যে যে ঐক্য পাওয়া যায় সে ঐক্যের জন্ম বৈচিত্র্যের মধ্যেই অর্থাৎ রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য থাকলেও

রাষ্ট্র বৈচিত্র্যে ভরপূর একথা অনস্বীকার্য—ষ্টেট ইজ্ এ ইউনিটি একথা যেমন সত্য, ষ্টেট ইজ্ এ ইউনিটি এমাং ডাইভারসিটি একথাও তেমন সত্য!

শাসক সম্প্রদায় ও সৈনিকদের প্লেটো যেভাবে রিক্ততা বরণ ক'রতে ব'লেছেন তা একান্ত অসম্ভব। কারণ তা মানুষের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তার উপর সর্বজনীন দ্রব্যে সর্বজনের অধিকার থাকলেও আসক্তি থাকে না; সুতরাং প্লেটোর সাম্যবাদের গোড়ার কথা নারী ও শিশুর উপর সমানাধিকারবাদকে আগেই বাদ দিতে হবে।

ব্যক্তিগত সম্পদ থাকার ফলেই নাগরিকেরা অধিকাংশ সময় অনেক সদ্‌গুণের অধিকারী হয়। দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকার প্রভৃতির নিবৃত্তির সম্ভব যদি ব্যক্তিগত সম্পদ থাকে। ব্যক্তিগত সম্পদের নাশ মানে হ'ল এই সব সদগুণের বিনাশ। এই সমস্ত সদ্‌গুণ-বিনাশে এ্যারিষ্টটলের ঘোরতর আপত্তি।

নারীর উপর সমানাধিকার দেওয়ার অর্থ হ'ল সমাজবন্ধনের গিঁটগুলো আলগা ক'রে দেওয়া এবং নৈতিক অবনতির প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করে দেওয়া। এবং এই দুই-এর অর্থ হ'ল রাষ্ট্রীয় সংহতির ভিতর ঘুণ ধরিয়ে দেওয়া। পরিবারই সৃষ্টি ক'রে স্নেহ ও ভালবাসার; সমাজবন্ধনের এ'দুটিই হ'ল কঠিনতম রজ্জু। এই রজ্জু দু'টি কাটলে রাষ্ট্রের সংহতি বজায় রাখা অসম্ভব।

পারিবারিক জীবন লোপ করার সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিষগুল্ম আঁপনা থেকেই গজিয়ে উঠবে এবং রাষ্ট্রদেহ হবে বিষে জর্জরিত। হয় ত' বা সন্তানই আপন মাতার উপর করবে পাপাচরণ কি বীভৎস!

তা'ছাড়া শিশুদের একশ্রেণী থেকে অপর শ্রেণীতে উন্নীত করার প্রচেষ্টা যে সফল হবে তার নিশ্চয়তা কি?

প্লেটোর কম্যুনিজম্ আঁকড়ে ধ'রেছে তাঁর কল্পিত প্রথম দুই শ্রেণীকে,

তৃতীয় শ্রেণীকে দিয়েছে বাদ। এর ফল হবে যে অক্টোপাশের কবলে কবলিত হ'য়ে প্রথম দুই শ্রেণীর নিশ্বাস যাবে ক্রমে বন্ধ হ'য়ে সেই অবসরে তৃতীয় বা উৎপাদক শ্রেণী ধীরে ধীরে গোকুলে বেড়ে উঠবে। ক্রমে এইরকম বৈষম্যের বৃদ্ধিতে প্লেটোর সাম্যবাদ অসাম্যবাদে পরিণত হবে।

মানুষের নৈতিক পরিসর যতদিন অপরিসর থাকে ততদিন গুরুদেবের সাম্যবাদের পরিকল্পনাকে বাদ দিয়ে রাখতে হবে, বললেন এ্যারিষ্টটল।

প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র অভিজাততন্ত্র। এই অভিজাততন্ত্রে তিনি পৌঁছুতে পেরেছিলেন কারণ অর্থনৈতিক ঐক্যে তিনি ছিলেন পূর্ণবিশ্বাসী। এই অর্থনৈতিক ঐক্য আনবে সাম্যবাদ এবং সাম্যবাদের জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে অভিজাততন্ত্রের সুদৃঢ় ইমারৎ। এ্যারিষ্টটল বললেন যে অর্থনৈতিক ঐক্যের বসবাস কল্পনারই রাজ্যে—বাস্তব জগতে তার কোন পাত্তা পাওয়া যায় না; আর অভিজাত-তন্ত্রের উপাসনার অর্থ হ'ল চরমতার উপাসনা। স্বর্ণ-সমক বিশ্বাসী দার্শনিক চরমতাকে গ্রহণ করতে উপদেশ দেন কি ক'রে ?

গোল্ডেন মীন তাঁকে ব'লে দিলে যে পলিটিই আদর্শ শাসনতন্ত্র কারণ পলিটিই চলেছে। অভিজাততন্ত্র ও জনশাসনের মাঝামাঝি পথ দিয়ে। জীবন হ'ল একটা বোঝাপড়া; তর্কশাস্ত্রের অনুশাসনে জীবন চলে না—লজিক হ'ল এক্সট্রিমিজম্ এবং বিশ্লেষণমূলক, বিশ্লেষণের, আওতায় এসে জীবন হয় উধাও; সুতরাং চাই একটা বোঝাপড়া একটা কম্প্রোমাইজ।

কম্প্রোমাইজই এ্যারিষ্টটলকে বলে দিলে যে আদর্শবাদের দিক দিয়ে অভিজাততন্ত্র কাম্য হ'লেও বাস্তববাদের দিক দিয়ে বিচার ক'রলে তার মূল্য অত্যন্ত কম। সুতরাং বাস্তববাদী গণতন্ত্র বা পলিটিকেই আদর্শ ব'লে গণ্য করবেন, স্বপ্নবিলাসীরা যা করেন করুন।

গুরুজীর মতে শিষ্যপ্রবরও বিশ্বাস করতেন যে রাষ্ট্রের ক্ষমতার

নেই পরিমাণ, কর্তৃত্বের নেই পরিসীমা। এ বিশ্বাস কিন্তু হার মেনেছে তাঁর স্বর্ণ-সমক তত্ত্বের কাছে অর্থাৎ গোল্ডেন মীন অনুসরণকারী এ্যারিষ্টটল পৃথিবীকে জানিয়ে গেছেন যে রাষ্ট্রেরও মাঝপথ দিয়ে চলা উচিত —তার কর্তৃত্ব কতকাংশে খর্ব করা উচিত। মানুষের জীবনের কয়েকটা বিষয়ে রাষ্ট্রের বিশেষ ও পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকা শুধু অযৌক্তিক নয়, অবাঞ্ছনীয়ও বটে ; সুতরাং মানবজীবন-নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্র হাত গুটিয়েও বসে থাকবে না আবার হাত বেশীও বাড়াবে না।

গোল্ডেন মীন তাঁকে বললে যে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা হবে আত্মনির্ভরতার পক্ষে পর্যাপ্ত আর সুশাসনের জন্য সম্ভাব্যরূপে স্বল্প। তারপর ব'লেছে যে জনসংখ্যা দশহাজারের বেশী হ'লে আদর্শচ্যুতি ঘটবে কিন্তু! যে রাষ্ট্রে একপ্রান্তে গোলযোগ সুরু হ'লে অপর প্রান্তে সংবাদ পৌছুতে দিনরাত্রি কাবার হয় তা এ্যারিষ্টটলের মতে রাষ্ট্রই নয়। রাষ্ট্রদেহ হবে জীবদেহের মতই ; এক অংশে কোন অনুভূতিতে অপর সমস্ত অংশ চঞ্চল হয়ে উঠবে মুহূর্তের মধ্যেই। বাংলায় বার ভুঁইয়া মাথা চাড়া দিলে দিল্লীর দরবার থেকে মাথা নীচু ক'রে দেবার প্রয়াসে প্রেরিত মানসিংহের যদি পৌছুতে দিন, মাস কেটে যায় তবে এ্যারিষ্টটল তাকে রাষ্ট্র বলতে প্রস্তুত নন। আজকের বিমান ও বেতারের যুগে স্বর্ণ-সমকের পূজারী তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের সীমা ও জনসংখ্যা কতটা বাড়াতে প্রস্তুত হ'তেন জানি না তবে তদানীন্তন পরিবেশে এথেন্সকেই লক্ষ্য ক'রে তিনি বলেছিলেন, দ্যাটস্ ফার এণ্ড নো ফারদার।

এ্যারিষ্টটলের আদর্শ রাষ্ট্র সমুদ্রোপকূলবর্তীও হবে না আবার সমুদ্র থেকে শত যোজন দূরেও থাকবে না। নাগরিকেরা বিলাস-ব্যসনেও আসক্ত হবে না আবার রিক্ততা, কঠোরতাকে বরণ ক'রে পিউরিটানও হ'য়ে উঠবে না। ধনীও হবে না, দরিদ্রও হবে না হবে মধ্যবিত্ত। পরিবারের বিলোপ সাধনেও এ্যারিষ্টটলের কোন সম্মতি নেই তবে

পরিবারের উপর রাষ্ট্রের প্রতিপত্তির তিনি সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। ভারচ্যু লাইজ্‌ ইন্‌ দি মিডল্‌ কোর্স—সুতরাং মধ্যম দেবতার কর উপাসনা। তাঁর আদর্শ বেদীর উপর তিনি সমক বা মধ্যম দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাঁকে প্রণতি জানিয়েছেন প্রতি পাদক্ষেপে। প্রবাদ ছিল যে ভারতবাসীরা নাকি যে কোন বিষয়ের সঙ্গেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে জড়িয়ে ফেলত। একবার এক আন্তর্জাতিক সভায় হাতি সম্বন্ধে এক ভারত-বাসীকে কিছু বলতে অনুরোধ করা হয়। বক্তা উঠেই জানান যে তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু হবে এলিফ্যাণ্ট ও বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজম্‌। তেমনি আদর্শ রাষ্ট্র সম্বন্ধে এ্যারিষ্টটলের বক্তব্যের বিষয়বস্তু হবে গোল্ডেন মীন ও আইডিয়াল ষ্টেট্‌—শুধু আইডিয়াল ষ্টেট নয়।

কার্যপদ্ধতিতে সাম্প্রতিক গণতন্ত্রগুলি এ্যারিষ্টটলেরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক’রেছে—গোল্ডেন মীনকেই ক’রেছে আশ্রয়। স্বাচ্ছন্দ্যনীতিতে চলছিল গণতন্ত্রগুলি উনিশ শতকে। বিশ শতকের কোঠায় পা দিয়ে দেখলে যে লেসেজ্‌ ফেয়ার আপামরসাধারণের প্রতি ফেয়ার ডীল ক’রতে অক্ষম; সুতরাং রাষ্ট্রের হাত বাড়ানো উচিত। রাষ্ট্র হাত বাড়িয়ে চেপে ধ’রলে ব্যক্তির হাত—গলা নয়। গলা চাপলে ডিক্টেটরশিপগুলো।

এপিকিউরিয়ান ও স্টোইক

এপিকিউরিয়ান ও স্টোইক।

সিটি ষ্টেটের দিন যে ঘনিয়ে এসেছে তা প্লেটোর ন্যায় এ্যারিষ্টটল্‌ও দেখতে পাননি। ফলে তাঁরা সিটি ষ্টেটের গুণগানই গেয়ে গেছেন সুর সপ্তমে। ভাঙ্গনের দু'একটা দিকে তাঁদের নজর পড়েছিল বৈ কি, কিন্তু তার দিকে তাঁরা বিশেষ নজর দেননি কারণ তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এই ভাঙ্গন সহজেই বোজান যাবে—সিটি ষ্টেটের দেহে শিক্ষার ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে তাকে আবার সুস্থ ও সবল করে তোলা যাবে।

তাঁদের এই বিশ্বাসে তাঁরা বিশেষ ভুল ক'রেছিলেন; তাঁরা মোটেই বুঝতে প্যারেননি যে ও ওষুধে সারবার রোগ এ নয়। কালরোগের প্রকোপে থেকে সিটি ষ্টেটের রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে যে তার সরে যাবার দিন এসেছে এবং তার স্থানাধিকার ক'রবে এক 'নূতন পদ্ধতি—বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য।

বার্ধক্য হেতু জীর্ণতা ছাড়াও অন্তর্জাত কয়েকটি ব্যাধি নগরী রাষ্ট্রের দেহকে আরও জরাজীর্ণ ক'রে ফেলেছিল। এই ব্যাধিগুলির কয়েকটি হ'ল জন্মগত আর বাকী সব হ'ল আহৃত যেমন অসাধারণ ক্ষুদ্রতা, সীমাহীন সংকীর্ণতা, অন্যায় স্বার্থপরতা, অনন্যসাধারণ কলহপ্রিয়তা, চরম স্বৈরাচারিতা প্রভৃতি। এ্যারিষ্টটলের সময়েই সিটি ষ্টেটের এই জরাজীর্ণ দেহে আবার কয়েকটি বিস্ফোটকের হ'য়েছিল উদয়—যেমন শক্তিশালী নগরী-রাষ্ট্র দ্বারা দুর্বল নগরীর উপর পাশবিক অত্যাচার ও অভূতপূর্ব আত্মঘাতী যুদ্ধ। প্রধান দুই নগরী এথেন্স ও স্পার্টা পেলোপনেসিয়ার সমরে সম্পূর্ণ কাবু হ'য়ে পড়েছিল। সিটি ষ্টেটের যখন এহেন অবস্থা তখন দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজেণ্ডারের বিজয়-বাহিনী সমগ্র গ্রীস চষে সমভূমি ক'রে ফেললে; নগরী-রাষ্ট্র সমূহের রাষ্ট্র হিসাবে অস্তিত্বের হ'ল সম্পূর্ণ বিলোপ এবং

ম্যাসিডনের বিশাল সামরিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পৌর শাসন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হ'ল। এ যেন স্বামীর পক্ষে পুরুষের সমস্ত অধিকার খুইয়ে গোঁপজোড়া নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা!

ঢাল তলোয়ারের যুদ্ধে হারলেও সংস্কৃতির যুদ্ধে জয়ী হ'ল গ্রীস; সমগ্র ম্যাসিডন সাম্রাজ্যকে গ্রীক সভ্যতা গ্রাস ক'রে ফেললে। ওরিয়েন্টাল হ'য়ে গেল হেলেনীক এবং হেলেনী হ'য়ে গেল বিশ্বজনীন।

পৌর সভার পরিবেশে গ্রীক রাষ্ট্রনীতি চিন্তা স্বভাবতঃই সঙ্গতিবিহীন হওয়ার ফলে হ'য়ে দাঁড়াল সম্পূর্ণ নিরর্থক। গুড্ লাইফের পরিবেশ আর নগরীর মধ্যে কোনমতেই আবদ্ধ থাকতে চাইল না; রাষ্ট্রনীতিও নাগরিককে বাঞ্ছিত জীবনের সন্ধান দিতে হ'ল সম্পূর্ণ অপারগ। রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে যে যোগাযোগ ছিল তা হ'য়ে গেল বিচ্ছিন্ন। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি বেড়েই চলল কিন্তু ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রের পরিধি হয়ে এল ক্রমে শোচনীয় ভাবে সংকীর্ণ। ফলে সিটি ষ্টেটের উপাসনা হয়ে দাঁড়াল সম্পূর্ণ নিরর্থক এবং দার্শনিককে ক'রতে হ'ল লক্ষ্য পরিবর্তন—সিটি স'রে গিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল সিটিজেন্।

এই নূতন যুগের দার্শনিকেরা সূর্যকিরণের মত প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে সিটি ষ্টেটের দিন একদিন ছিল কিন্তু আজ আর নেই এবং শুধু রাষ্ট্রনীতির উপর ভর ক'রে সম্মানের সঙ্গে জীবনের পথে চলা সম্ভব নয় —গুড্ লাইফ খুঁজতে হবে নগরীর বাইরে। যাঁরা নূতন পথ খুঁজতে বেরিয়ে ছিলেন তাঁরা হ'লেন এপিকিউরিয়ান ও স্টোইক।

এপিকিউরিয়ানের গুরু এপিকিউরাস সোজা সোফিষ্টদের প্রবৃত্তিমার্গে বা হেডোনিজ্‌মে এবং হিতবাদে ফিরে গেলেন। প্লেটোর মত যে রাষ্ট্রার্থে জীবন, যৌবন, ধনমান এপিকিউরাস ও তাঁর শিষ্যবর্গের মনে হয়েছিল সম্পূর্ণ ভুল। এপিকিউরাস শেখালেন যে আত্মার্থেই সব, রাষ্ট্রার্থে নয়— আত্মসুখই জীবনের উদ্দেশ্য-আত্মনি তুষ্টে জগৎ তুষ্টে। এবং এই

আত্মতুষ্টির লক্ষ্যস্থানে পৌঁছোবার জন্য রাষ্ট্র হ'ল পাকা সড়ক। এই সড়ক মানুষ বানিয়েছে নিজের প্রয়োজনে এবং প্রয়োজন হ'লে চষে আবার সমভূমির সঙ্গে একাকার ক'রে দেবে। নৈসর্গিক ঘটনার মত এ আদি অন্ত বিহীন নয়; অনাদিকালের কারণসিন্ধু মাঝে অনন্ত শয্যায় শায়িত নাভিপদ্মের মত রাষ্ট্র জন্মবিহীন নয়। রাষ্ট্র কৃত্রিম এবং তার অস্তিত্ব উপযোগিতার উপরই নির্ভর করে। আইন? আইনেরও উদ্ভব উপযোগিতার উর্বরভূমিতে। বাস্তবতঃ ন্যায়ের কোন অস্তিত্বই নেই। ধর্ম? ধর্ম এক নিষ্ঠুর কল্পনা ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়; এই নিষ্ঠুর কল্পনা এক কল্পলোকের সন্ধান দেয় যা অসত্য—অস্তিত্ববিহীনও বটে। সুতরাং এপিকিউরাস উপদেশ দেন যে সকল সামাজিক কর্তব্যের কর অবসান, রাষ্ট্রকে শত হস্ত দূর থেকে কর করজোড়ে নমস্কার এবং কটিদেশ বন্ধনপূর্বক সোৎসাহে রত হও আত্মতুষ্টির কাজে। সকলেই নিজের প্রতি কর্তব্য পালন কর যথাযথভাবে তা হলেই দেখবে যে রাষ্ট্র সহজেই হ'য়ে উঠেছে নিরর্থক।

এপিকিউরিয়ানদের এই মতবাদ যে হেয় তা নয়। আত্মতুষ্টি ব'লতে এপিকিউরাস কখনও ইন্দ্রিয় সুখাশক্তি বোঝাতে চাননি। না বোঝাতে চাইলেও অনুশীলনে এপিকিউরিয়ানিজম্ পরিণত হ'য়েছিল চরম অসংযম ও অসাধুতায়। অসংযমী, অসাধু জীবনযাত্রার এপিকিউরিয়ানরা যখন সমস্ত সামাজিক কর্তব্যকে এড়িয়ে চলতে আরম্ভ ক'রলে তখন সঙ্গে সঙ্গে তাদের রোমানদের মনে দাগ কাটার আশাও জলাঞ্জলি দিতে হ'ল. কারণ ঐতিহ্য পরম্পরায় রোমানরা সামাজিক কর্তব্যকে স্থান দিত বিশেষ উচ্চে।

গ্রীসের শেষ রাত্রির বাসরে দু'একখানা গান গেয়ে এপিকিউরিয়ানরা সরে গেলেন। সে গান রোমানদের মোটেই ভাল লাগল না। তাই রোমের বৌভাতের আসর জমাবার জন্য ডাক পড়ল স্টোইকদের।

স্টোইক

জীবনের রঙ্গমঞ্চে সমুজ্জল উল্কার মত আলেকজেণ্ডারের অতি ক্ষণস্থায়ী অভিনয় শেষ হ'লে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার দাবী ক'রল রোম। প্রকৃত অর্থে রোমই আলেকজেণ্ডারের উত্তরাধিকারী ও নীতির অনুসরণকারী। ম্যাসিডনের মত রোমও ছিল হেলেনীক—গ্রীক সভ্যতা রোমে হ'ল পরিব্যাপ্ত। সিটি ষ্টেটের স্তবস্তুতি যখন সাম্রাজ্যবাদী রোমে চলল না তখন স্টোইক দার্শনিক নূতন বাদ্যযন্ত্রে অশ্রুতপূর্ব সঙ্গীতের ক'রতে লাগলেন পরিবেষণ। রোমানরা শুনলে মন দিয়ে এবং হৃদয় দিয়ে ক'রলে গ্রহণ।

জেনো হ'লেন স্টোইকদের আদিপুরুষ। তাঁর মতবাদের সঙ্গে গ্রীক রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় সর্বপ্রথম খানিকটা ওরিয়েণ্টাল এলিমেণ্ট পরিষ্কারভাবে প্রবেশ ক'রল কারণ তিনি ছিলেন গ্রীসের বাইরের লোক। সিটি ষ্টেটের অধিবাসীও তিনি ছিলেন না তাই নগরীরাষ্ট্র তাঁর মনকে নাড়া দেবার কোন অবকাশ পায়নি;—তাঁর চিন্তার কোন ছত্রে সিটি ষ্টেটের প্রতি অনুরাগের নিদর্শন পাওয়া যায় না।

স্টোইকরা শেখালেন যে জীবনে কর্তব্যই ধ্রুবতারকা, আত্মসুখ ভোগ নয়। সন্তোষ ও শান্তির সন্ধানে এলোপাতাড়ি ঘুরে বেড়ান ছেড়ে দিয়ে তাঁরা আকাঙ্খার সংখ্যাকে পরিমিত ক'রে তুলতে চাইলেন। স্টোইক বললেন যে পরিতৃপ্তির সংখ্যাবৃদ্ধির দ্বারা সুখের সন্ধানের চেষ্টা করা মহা ভুল—পরিতুষ্টির মধ্যে সুখের বসবাস নয়। এক আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিতে হয় অপর এক আকাঙ্ক্ষার উদয়···ভোগের দ্বারা কখনও কামনার উপশম হয় না, হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব···ঘৃতের দ্বারা অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিতই হয়···তৃষ্ণার

শেষ নেই। সুতরাং যদি আকাঙ্ক্ষার সংখ্যাকে প্রাপ্তির সম্ভাবনার গণ্ডীর মধ্যে আনতে পার তবেই দেখবে যে জগতে…'সুখের নাই শেষ।' বাহ্যিক ঘটনার প্রতি মনোনিবেশ করার কোনই প্রয়োজন নেই। এ জীবন হ'ল শিক্ষার্থীর জীবন ; এ জীবনে আমি নরপতি হ'লাম কি ক্রীতদাস হ'লাম তাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। সুতরাং ঐহিক কোন কিছুতে বিচলিত হওয়া অনুচিত। ঐহিক সব কিছু পারিত্রিকের সোপান মাত্র। এই প্রোবেশনারি জীবনে সমস্ত ছোটখাট পরীক্ষায় যদি আমরা সসম্মানে উত্তীর্ণ হ'তে পারি তবেই প্রকৃত জীবনে অর্থাৎ অপর জগতে প্রকৃত সুখের সঙ্গে মোলাকাৎ ক'রতে হব সক্ষম।

স্টোইকদের জীবনদর্শনের একটা দিকের সঙ্গে আমাদের হিন্দু জীবন-দর্শনভঙ্গীর অদ্ভুত মিল আছে। হিন্দু দর্শনে জীবনকে পান্থশালা ব'লে অভিহিত করা হয়েছে সুতরাং এই পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ মুসাফিরের মতই—ক্ষণস্থায়ী। রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পান্থশালাকে ছেড়ে চ'লে যেতে হবে প্রকৃত আবাসাভিমুখে। জীবনকে ফলে, ফুলে শোভিত করবার কোনই প্রয়োজন নেই! পান্থশালাকে কেই বা গৃহ মনে করে, কেই বা সাজায় নবসজ্জায়? পারত্রিকের উদ্দেশ্যে ঐহিক সমস্তকে নিয়োজিত ক'রে হিন্দুরা জীবনকে ক'রে তুলেছিল রিক্ত ও কঠোর।

নূতন জীবনদর্শন আনলে মুসলমানেরা এদেশে। জীবনকে দিলে তারা এক নূতন সংজ্ঞা এবং তাকে উপভোগ করবার জন্য ক'রলে অভূতপূর্ব আয়োজন। তারা ভালবেসে চোখের জলে ভাসলে, অপরকে চোখের জলে ভাসালো। দেওয়ানী খাস তৈরী করে পৃথিবীতে স্বর্গ আনবার চেষ্টা করলে, তাজমহল গ'ড়ে ভালবাসাকে ক'রতে চাইলে কালজয়ী।

জীবনদর্শনে হিন্দুর সঙ্গে মিল থাকলেও স্টোইককে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী মনে করা ভুল—সম্পূর্ণ ভুল। জাতীয়তাবাদীও সে নয়, আন্তর্জাতিকতা-

বাদীও তাকে বলা চলেনা। প্রকৃতপক্ষে স্টোইক হ'ল কসমোপলিটান—জগন্মিত্র—সিটিজেন্ অফ দি ওয়ার্ল্ড্। এই জগন্মিত্রই জগৎকে প্রথম শোনালে সাম্য ও মৈত্রীর গান।

স্টোইকের মতে সমগ্র মনুষ্যজাতি এক। রোমানের সঙ্গে গ্রীকের বা গ্রীকের সঙ্গে বর্বরদের পৃথক দেখতে স্টোইক চাননা। সকল রাষ্ট্রকেই স্টোইক ন্যাচার‍্যাল বলতে প্রস্তুত নন। রাষ্ট্র তখনই হবে প্রকৃতিসিদ্ধ বা ন্যাচার‍্যাল যখন হবে রোমক সাম্রাজ্যের মত বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বজনীন। এ্যারিষ্টটলের মত সিটিষ্টেটকে স্বভাবোৎপন্ন বলতে স্টোইক মোটেই প্রস্তুত নন। নগরী-রাষ্ট্র হ'ল সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক এবং সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক সব কিছুই কৃত্রিম কারণ প্রসারতার মধ্যেই স্বাভাবিকতার যাওয়া আসার পথ।

এ ছাড়া স্টোইক ব'লতেন যে প্রকৃতির একটা নিয়ম আছে, সে নিয়ম অমোঘ—ব্যতিক্রমবিহীন। সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে ও পশ্চিমে অস্ত যায়; মেঘাচ্ছন্ন না থাকলে দু'সময়েই দেখা যাবে আকাশে রাঙা আবিরের খেলা—কোনও ব্যতিক্রম হবেনা। পতিত উল্কা মাধ্যাকর্ষণে পৃথিবীতেই আসবে, মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবেনা। অসীম, অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত ও সর্বজনীন নিসর্গজগতের এই যে নিয়ম এর প্রভাব আছে মানুষেরও রাজ্যে—মানুষেরও জগতে।

ন্যায় বলতে স্টোইক বুঝতেন এই নিসর্গ সংহিতারই নির্দেশ অর্থাৎ 'ন্যায়' প্রাকৃতিক নিয়মের মতই অপরিবর্তনীয়। পৃথিবীর নামক উপগ্রহ-বাসী মানুষের রাজ্যে এসে তার প্রকৃতির পরিবর্তন হয়নি—হ'তে পারেনা। ন্যায়ের প্রকৃতি শাশ্বত—পরিবর্তনের স্রোতে ভাসা নয়।

ধর্ম কি? স্টোইক বলতেন যে ধর্ম হ'ল সর্ব-পরিব্যাপ্ত প্রজ্ঞা—যে প্রজ্ঞা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বর্তমান আছে প্রকৃতির মধ্যে ও প্রকৃতি সংহিতার মধ্যে। ধার্মিকের কর্তব্য হ'ল এই প্রজ্ঞার প্রতি নতি স্বীকার করা ও

তার আজ্ঞানুবর্তী হওয়া। সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় যে ধর্মানুসরণকারীকে স্টোইক উপদেশ দিয়েছিলেন কর্তব্যানুসরণ ক'রতে এবং কোনটি কর্তব্য এবং কোনটি অকর্তব্য তার নির্ধারণে বিবেকের অনুশাসন মানতে। সুতরাং স্টোইক বললেন, 'হে ধার্মিক! ধর্মপালন তুমি ক'রতে চাও ত' হও বিবেকের দাস, প্রজ্ঞার অনুবর্তী।'

স্‌টোইকরা প্রজ্ঞা বা র‍্যাশানালিজম্‌কে বিবেক বা কন্‌সেন্স থেকে বিশেষ তফাৎ ক'রে দেখেছেন। কনসেন্স ও র‍্যাশালাজিমের মধ্যে এই যে ভেদসৃষ্টি এ মোটেই অযৌক্তিক নয়। কনসেন্স মানুষের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার কিন্তু প্রজ্ঞার উৎপত্তি খুঁজতে হ'লে যেতে হবে নিসর্গ জগতে। এইরূপে নিসর্গজগৎ ও লোকজগতের মধ্যে একটা সম্বন্ধস্থাপন ক'রেছিলেন গ্রীক স্‌টোইকরাই। রোমান স্‌টোইক সিসেরোর হাতে এসে সে সম্বন্ধ হ'ল পাকা।

দেবতা সম্বন্ধে স্‌টোইকরা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। দেবতা থাকুন আর নাই থাকুন তাতে স্‌টোইকের কিছুই যায় আসে না। যদি দেবতা নাই থাকেন তবে দেবতাকে বাদ দিয়েও স্‌টোইকের চলবে আর যদি তাঁরা থাকেন সর্বদিক পরিব্যাপ্ত করে তাহলেও বিবেকানুবর্তী স্‌টোইক তা গ্রাহ্য ক'রবে না। অবমাননার জন্য দেবতা যদি শাপ দেন? বিবেকের বর্মে প্রতিহত হয়ে সে অভিশাপ হবে ব্যর্থ। দেবতা যদি শাস্তি দেন? স্‌টোইক সহ্য করবে সে শাস্তি—পান্থশালার এই দুঃখকে সে ক'রবে হাসিমুখে বরণ।

স্টোয়িসিজমের কোরকের দেখা পেয়েছিলাম গ্রীসের ভাঙা হাটে। রোমান দার্শনিকগণের হাতে সেই মুকুল হয় সম্পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত। সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য রোমান স্‌টোইকরা হ'লেন তিন জন: পলিবিয়াস্‌, সিসেরো ও সেনেকা। স্‌টোইক দর্শনের ফুলকুসুম অনেক শতাব্দী ধ'রে রাষ্ট্রনৈতিক দার্শনিকদের মনকে করে রেখেছিল আচ্ছন্ন। ন্যাচারল ল বা

অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত নিসর্গ সংহিতা রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনকে দেখিয়েছিল পথ মধ্যযুগের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। সাম্প্রতিক যুগে এসে ন্যাচারল ল' হ'য়ে গেল বাতিল। মেকিয়াভেল্লি, হব্স্, বোডিন প্রভৃতি রাষ্ট্রিক সার্বভৌমত্বের পূজারীগণ নিসর্গ সংহিতাকে ব'ললেন যে,

গ্রহণ করিতে পারিব না

তোমায়

হে বন্ধু বিদায়!

রাষ্ট্রিক সার্বভৌমত্বের পূজারীগণ বিদায় দিলেও লক্ ও রুশো আবার নিসর্গ সংহিতাকে ডেকে বসালেন সিংহাসনে। রুসোর সাম্যবাদ স্টোইকদের প্রকৃতি সংহিতার ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু এই ভিত্তি হ'য়ে গিয়েছিল পুরোনো ও বড় নড়বড়ে। তাতে ধাক্কা দিলেন বেন্থাম ও বার্ক। বেন্থাম বললেন, নিসর্গ সংহিতা একটা কল্পনা মাত্র। বার্ক বললেন, অরাজকতার জীর্ণরূপ। ন্যাচারল ল নেচারেরই ল হ'য়ে রইল, মনুষ্য-রাজ্যে তার গতিবিধি হ'ল লুপ্ত—সাম্প্রতিক দার্শনিকেরা তার চারদিকে কড়া পাহারা বসিয়ে দিলেন।

রোম

রোম

পলিবিয়াস ছিলেন একজন গ্রীক। গ্রীক হলেও রোমের সঙ্গে ছিল তাঁর অন্তরের বন্ধন। রোমের ইতিহাস তিনি পাঠ ক'রেছিলেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। পাঠেই ক্ষান্তি নয়—পাঠের ফল রেখে গেছেন পরবর্তী যুগের জন্য। পাঠে গভীরতা সত্ত্বেও তাঁর দর্শনে তিনি দৃষ্টি অপেক্ষা কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন অনেক বেশী। এক প্রাক-রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার কল্পনাও তিনি করেছেন। এই অবস্থায় সভ্যতার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। ক্রমে বলপ্রয়োগের দ্বারা সৃষ্টি হ'ল একাধিপত্যের! একাধিপত্য বা একনায়কত্বের পরবর্তী অধ্যায় হ'ল রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রে একাধিপতির ব্রত প্রজারঞ্জন—হস্তে তাঁর ন্যায়দণ্ড। রাজতন্ত্রের পর আবির্ভূত হ'ল স্বৈরাচারতন্ত্র। স্বৈরাচারিতার পালা শেষ হ'লে এল সংকীর্ণতন্ত্র বা অলিগার্কি এবং তারপর স্রোতধারা ব'য়ে এল জনশাসন বা মব রুল। পলিবিয়াসের মতে, এইভাবেই শাসনপদ্ধতির পরিবর্তন সাধিত হয় বিবর্তনের ধারায়। স্থায়ী হবে সেই রাষ্ট্রই যে রাষ্ট্র সরকারের বিভিন্ন রূপের মধ্যে বোঝাপড়া ক'রে একটা সুসঙ্গত রূপ দাঁড় করাতে পারবে; রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে ঐক্যসাধনের উপরেই রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের ভিত্তি-মিশ্র শাসনপদ্ধতিই হ'ল স্থায়ী। রোম শক্তিশালী ও কালজয়ী কারণ তার শাসনপদ্ধতির মধ্যে এই তিন তন্ত্রের হ'য়েছে অপূর্ব মিলন। এই মিলনের বা মিক্সড্ কনষ্টিটিউসনের গুণকীর্তনে পলিবিয়াস ভরিয়েছেন পাতার পর পাতা।

শাসনযন্ত্রের অংশগুলির পরস্পরের মধ্যে যে একটা গতিরোধের ও সমতা রক্ষার দরকার তা পলিবিয়াসই প্রথম উপলব্ধি করেন। ক্ষমতার

এক মোহিনী শক্তি আছে, তা নিজের দোষ দেখতেই দেয় না বরং দোষকে গুণরূপে দেখাতে সাহায্য করে। ফলে শাসকেরা শোষক হ'য়ে উঠলেও নিজেদের বিকৃতরূপের খবর তাঁদের কানে পৌছোয় না। এবং অধিকাংশ সময় তাঁরা নিজেদের মঙ্গল এবং সর্বসাধারণের মঙ্গলের মধ্যের সীমারেখাটি হারিয়ে ফেলেন। ফলে যখন তাঁরা নামেন 'পতনের পথ বাহিয়া' তখন কিন্তু ভাবেন যে চলেছেন পর্বতশিখরাভিমুখে। এই ভ্রান্তি দূরীকরণের জন্ম এবং নিম্নগতি রোধের জন্ম চাই সরকারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সহ-যোগিতার সঙ্গে সঙ্গে সমতা রক্ষা। সমতা রক্ষিত না হ'লে শক্তিশালী অঙ্গ দুর্বলাঙ্গের গলা টিপে ধরবে। এবং ফলে হয় কর্মবিভাগ, না হয় ব্যবস্থা বিভাগ, না হয় বিচার বিভাগ করবে অপর দুই বিভাগের সর্বশক্তি হরণ।

পলিবিয়াসের চেকস্ ও ব্যালান্সের এই যে থিওরি এ তাঁর প্রবলানুরাগের সহিত মিশ্র শাসনপদ্ধতির পক্ষ সমর্থনের ফল। রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে তুলনীয় সাধারণ লক্ষণগুলির সন্ধান পলিবিয়াস কখনও পান নি। রাষ্ট্র তাঁর মতে একটা কৃত্রিম সংগঠন—এই সংগঠনের ভিত্তি হল পরস্পর বিরোধী শক্তিসমূহের মধ্যে একটা আপোষ সাধন। রোম এই আপোষ সাধিত করেছে অনন্তসাধারণরূপে তাই সে শ্রেষ্ঠ সংগঠন—আদর্শ রাষ্ট্র।

কিমাশ্চর্যম্! মৃত্যুর পূর্বেই পলিবিয়াস তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র রোমের পতনের লক্ষণ লক্ষ্য করেছিলেন। দেখেছিলেন যে রোমের পাকা ভিতে কি জানি কি ঘুণ ধ'রেছে, তার বহু প্রশংসিত ঐক্যের হ'য়েছে বিনাশসাধন এবং তার স্থানাধিকার করেছে—বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা! হতবাক পলিবিয়াস এর আর কারণানুসন্ধান করতে পারেন নি বা চেষ্টাই করেন নি। চেষ্টা করেছিলেন শতবর্ষ পরে দার্শনিক সিসেরো।

জুলিয়াস সীজার তখন রোমের ভাগ্যবিধাতা। কেমন করে রোমের সাধারণতন্ত্র সীজারের একনায়কত্বের এলাকার মধ্যে গিয়ে প'ড়ছিল তা

দার্শনিক সিসেরো অপার বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য ক'রছিলেন। সীজারকে তিনি ভয় ও ঘৃণা দুইই ক'রতেন। এই ঘৃণা ও ভয়ের সমবায়ে উদ্ভূত ভাবের রং তিনি চড়িয়েছিলেন গ্রীস থেকে পাওয়া তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের উপর। প্র্যাকটিক্যাল রোমান হিসেবে তিনি সমসাময়িক রোমের বিচারও করেছিলেন। বিচারের মাপকাঠি হ'ল এ্যারিষ্টটল, প্লেটো ও পলিবিয়াসের সংমিশ্রণ। সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রোম আজ পতনোন্মুখ কেন? এর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে পলিবিয়াসের মতবাদের মধ্যেই, সিসেরো বললেন। রোমের শাসনতন্ত্রে ঘটেছে সমতার একান্ত অভাব কারণ গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি হয়েছে অভূতপূর্বরূপে শক্তিশালী। এই গণতান্ত্রিক শক্তি আবার অপহরণ করেছে মেরিয়াস ও সীজারের মত ডেমাগগ্‌রা; অতএব এই অধঃপতন—বুঝিলে? ব্ল্যাকবোর্ডে সোজা অঙ্কের মত সিসেরো সমস্যা বুঝিয়ে দিলেন। সমস্যা বোঝান হ'ল এক কথা আর তার সমাধানের সন্ধান দেওয়া হ'ল আর এক। সমাধান করতে গিয়ে তিনি পদে পদে বাধা দিতে লাগলেন সীজার ও পরে সীজারের ভাইপো অগাষ্টাসকে। ফল হ'ল তাঁর মস্তকচ্যুতি। রোমকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন দার্শনিক সিসেরো কিন্তু রোম ত' দূরের কথা নিজের মস্তকও বাঁচাতে পারলেন না তিনি। গ্রন্থলেখকের পক্ষে রাষ্ট্রসেবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল হয় না। সিসেরোর বেলাতেও হ'ল না।

রোমকে কিছু দান করতে অক্ষম হলেও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারাকে সিসেরো দান ক'রেছেন অনেক কিছু। এ্যারিষ্টটলের কথা যে প্রকৃতি-বলেই মানুষ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীব—সিসেরোকে আকর্ষণ করেছিল বিশেষভাবে। তাই তিনি গড়তে চেয়েছিলেন সার্থক সমাজ ও সার্থক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের অধিবাসী হ'লেই নাগরিকতার ছাপ পাওয়া যায় না—রাষ্ট্রের প্রতি যথাকর্তব্য সম্পাদন ক'রে তবেই নাগরিক পদবাচ্য হ'তে হয়, বললেন সিসেরো। অনেক সময় ব্যক্তিস্বার্থের সহিত সাম্প্রদায়িক স্বার্থের

সংঘাত হ'তে পারে। এইরূপ সংঘাতে হয় রাষ্ট্রের প্রভূত ক্ষতি। তাই নাগরিকের কর্তব্য হ'ল ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গে সম্প্রদায়গত স্বার্থের সুষ্ঠু মিলন সম্পাদন। সিসোরোর মতে এ মিলন সম্ভব। রাষ্ট্রকল্যানার্থে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের মধ্যে এই যে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা এ হ'ল রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনে সিসেরোর অনন্যসাধারণ দান। এর চেয়ে বড় দান কিন্তু হ'ল—বাস্তব জগতের রোমক আইন ও স্টোইকদের প্রাকৃতিক আইনের অভিন্নতা প্রমাণের চেষ্টা। রাষ্ট্রনৈতিক সিদ্ধান্তে একেই বলা যায় সিসেরোর বিশিষ্টতম দান।

তাঁর এই পলিটিক্যাল থিওরির দ্বারা তিনি নামিয়ে আনলেন প্রকৃতির আইনকে কুয়াসার মেঘে ঢাকা স্বর্গের অস্পষ্টতা থেকে এই ধূলিধূসরিত পৃথিবীতে এবং ঘোষণা করলেন যে ন্যাচারল ল'র মূল নীতিগুলি—সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রী—এই উপগ্রহবাসী মানুষ নামক জীবের পক্ষেও প্রযোজ্য। এক কথায় সিসেরো ক'রলেন স্বর্গকে মাটীতে টেনে আনবার চেষ্টা বা প্রয়াস পেলেন রামরাজ্য স্থাপনের; বললেন তিনি, জীবন হ'ক সুন্দর, পথ হ'ক সুগম ও লক্ষ্য হ'ক শিব। আদর্শবাদী দার্শনিক কিন্তু আদর্শের বর্মাবরণে রোম বা মস্তক কোনটাই রক্ষা করতে পারলেন না।

সিসেরোর পর সেনেকা স্টোইকদের স্বর্ণযুগের পুরাতন চিত্রের উপর আর একবার গাঢ় রং চড়াতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বললেন, স্বর্ণযুগ ছিল—সত্যই ছিল এই মাটীর পৃথিবীতে এবং দ্বিপদবিশিষ্ট মানব-নামক জীবই ছিল একদিন স্বর্ণযুগে। ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি রিপুর বশীভূত সে ছিল না; তাই ছিল না। মানুষে মানুষে প্রভেদ। মৈত্রী ও সাম্য বেঁধেছিল সমগ্র মানবজাতিকে একই সূত্রে। তারপর মানুষের লোভই একদিন তাকে বিতাড়িত করলে নন্দনকানন থেকে—মানুষের হ'ল পতন। পতিত দুর্বল মনুষ্য সৃষ্টি করলে রাষ্ট্রের; সুতরাং

দি স্টেট ইজ্ নট্ এ ন্যাচারাল ইনষ্টিটিউশন—জোর গলায় জানালেন রোমান স্টোইক সেনেকা।

স্বর্ণযুগ ছিল সেনেকার কল্পনায়; সম্মুখে কিন্তু ছিল দুটি পথ—স্বেচ্ছাচারিতা এবং অরাজকতা। এই দু'টির মধ্যে তিনি অরাজকতাকেই আলিঙ্গন ক'রেছিলেন। অরাজকতার অবসান হ'য়ে আবার তাঁর আইডিয়েল—স্বর্ণযুগ আসতে পারে যদি মানুষ হয় নির্লোভ—প্রথমে এই ছিল তাঁর আশা। এ আশা যে পূর্ণ হবেনা পরে সেনেকা তাও বুঝতে পেরেছিলেন কারণ মানুষ অনেক নীচে নেমে গেছে আর উপরে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়! আশা যখন সফল হবার কোন সম্ভাবনাই রইল না তখন তিনি গ্রহণ করলেন বানপ্রস্থ এবং শ্যাম সমান মরণের করতে লাগলেন আরাধনা।

সেনেকার পর প্লেটো বা এ্যারিষ্টটলের পায়ের ধূলো নেবার মত উপযুক্ত রাষ্ট্রনৈতিক দার্শনিক রোমে আর কেউ জন্মায় নি। রোমকরা ছিল দিগ্বিজয়ী; শাসক হিসেবেও তাদের তুলনা মেলা ভার। রাস্তা বানিয়ে, পরিখা কেটে, খনির সংস্কার ক'রে লক্ষ্মীর পূজা তারা করেছিল ষোড়শোপচারে। আইন প্রবর্তনে তারা আজও জগতের যে কোন সভ্য জাতির উপরে টেক্কা দিচ্ছে, কিন্তু জ্ঞানক্ষেত্রে তারা নূতন কিছু দেখতে পারনি। দর্শনে তারা গ্রীসের শিষ্যত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছিল সোজাসুজিই। শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে গুরুকে ছাড়িয়ে যাবার প্রয়াসে বা নূতন কিছু সৃষ্টিতে তারা কখনও সফল হয়নি। ফলে তাদের দর্শন হ'য়েছে গ্রীক দর্শনের অন্ধ অনুকরণ মাত্র। রাষ্ট্রনৈতিকদর্শন-প্রতিমার উপর পলিবিয়াস প্রমুখ পলিটিক্যাল চিন্তাবীরগণ দু'এক পোঁচ রং চড়িয়েছিলেন সত্য কিন্তু নূতন কাঠামোর কোনরূপ পরিকল্পনা তাঁদের ধ্যানধারণায় আসেনি। কাঠামো রইল সেই গ্রীসের—সেই এ্যারিষ্টটলের, সেই স্টোইক ও এপিকিউরিয়ানদের।

নিউ টেষ্টামেণ্টের রাষ্ট্রনীতি

নিউ টেষ্টামেণ্টের রাষ্ট্রনীতি

রোম ছেড়ে মধ্যযুগে আসবার আগে পথের গল্প কিছু শোনা যাক। পথের গল্প বলতে নিউ টেষ্টামেণ্টের রাষ্ট্রনীতিকে বুঝতে হবে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মাঝখানে সেতু বাঁধা হ'য়েছে প্রথম খৃষ্টীয় যুগের রাষ্ট্রনীতির দ্বারা।

রিপাবলিকান রোমের শেষভাগে মানবজাতির পরিত্রাণকর্তা যিশুখৃষ্ট জেরুজালেমে মুক্তিপথের সন্ধানের সূত্র ব্যাখ্যা ক'রছিলেন তার বারজন শিষ্যের কাছে। যিশু আর বারজন সর্বসমেত তেরজন মিলে হয়েছিল ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্র এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি যে সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা রাষ্ট্রের আভাষ হয়ত বা পাওয়া যেতে পারত। এই যে অপূর্ব রাষ্ট্র এর সঙ্গে লৌকিক পরিদৃশ্যমান কোন কিছুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না এবং যিশু আর তাঁর শিষ্যবর্গ রাষ্ট্রনীতিকে করতেন অদ্ভুতভাবে উপেক্ষা—শাশ্বত, অদৃশ্য এক মহাশক্তি নিয়েই ছিল তাঁদের বেসাতি।

খৃষ্টধর্ম য়িহুদিদের মনে এরূপ এক বিশ্বাস জাগিয়ে দিল যে যিশুর রাজ্যকে রোমক সাম্রাজ্যের শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে প্যালেষ্টাইনকে রোমের ঘৃণ্য অধীনতাপাশ থেকে মুক্ত করা সম্ভব। য়িহুদিদের এই বিশ্বাস আবার অপর দিকে রোমক সরকারের মনে জাগিয়ে তুলল ভীতি। তাঁরা এই সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনাশ সাধনের প্রয়াসে রইলেন। প্রয়াস বিফলে গেলনা। শেষ পর্য্যন্ত য়িহুদিদের সম্ভাব্য নরপতি, মানবজাতির পরিত্রাণকর্তা যিশুখৃষ্টকে প্রাণত্যাগ ক'রতে হ'ল ক্রুশবিদ্ধ হ'য়ে।

বারজন শিষ্য নিয়ে মহামানব জগতের যে কল্যাণ সাধনে চেষ্টিত ছিলেন তা য়িহুদি বা রোমান কারও দৃষ্টিগোচরে আসেনি। বারবার যিশু জানিয়ে গেছেন যে রাজ্য তিনি স্থাপন ক'রতে চান বটে—ব'লতে

কি রাজ্য তিনি স্থাপন ক'রেছেন ; কিন্তু তাঁর রাজ্য ত' ইহজগতের রাজ্য নয় কারণ তাঁর ব্যবসা হ'ল ইটারন্যাল ও আনসীন যা কিছু নিয়ে। নশ্বর, পরিদৃশ্যমান কোন কিছুর সাধনা তিনি করেন নি—কোন কিছুর প্রতি লোভও তাঁর নেই। তিনি এক দূর জগতের পথের সন্ধান দিতেই ব্যস্ত যে জগতে রাষ্ট্রনীতির কলুষ পৌঁছে তার নির্মলতা নষ্ট করেনা—এবং সেই তাঁর একমাত্র কাজ।

পলিটিক্স সম্বন্ধে এইরূপ অপার নির্লিপ্ততা দেখাতে গিয়ে তিনি আর একটি কথা ব'লেছিলেন যে কথা রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার ক'রে আছে। 'সীজারের যা কিছু দাও সীজারকে, ঈশ্বরের যা কিছু সমর্পণ কর ঈশ্বরকে'—এ হ'ল তাঁর উপদেশ। 'সীজার' শব্দটি যিশু এখানে রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এই উপদেশের প্রথম অর্থ: রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন—দ্বিতীয় অর্থ: প্রকৃত অর্থে ধর্ম থাকবে রাষ্ট্রের আওতার সম্পূর্ণ বাইরে। ধর্মের এই মোক্ষের জন্য তিনি 'সীজারকে' তার প্রাপ্য সমস্ত কিছু এককথায় বুঝিতে দিতে চেয়েছিলেন। প্রাপ্য সমস্ত কিছু পেয়েও 'সীজার' সন্তুষ্ট হলনা। সে চাইলে আরও কিছু—ঈশ্বর প্রেরিত দূতের প্রাণ!

ক্রুশবিদ্ধ হ'য়ে যিশুখৃষ্ট প্রাণত্যাগ ক'রলেন বটে কিন্তু খৃষ্টধর্ম ছড়িয়ে পড়ল দিক্‌বিদিকে, ক'রলে হৃদয়জয় বিভিন্ন দেশবাসীর। এসিয়া, ম্যাসিডোনিয়া করতল বা পদতলগত করে সবশেষে খৃষ্টধর্মের বিজয়-বাহিনী এসে পৌঁছুল রোমের দ্বারদেশে।

দ্বারদেশে পৌঁছে রোমের নাগরিক সেণ্ট পল ধরনা দিয়ে পড়ে রইলেন: হে রোমক সাম্রাজ্য! তোমার সর্বশক্তি দিয়ে আমার শিশু-ধর্মকে, আমার নবনির্মিত গির্জাগুলোকে বাঁচাও, বাঁচাও! রোমান নাগরিকের এই প্রার্থনাকে উপেক্ষা ক'রতে পারলে না রোমের রাজশক্তি

—দিলে সাহায্য, পেলে সাধু পলের অন্তরের কৃতজ্ঞতা। এই কৃতজ্ঞতার বীজ অঙ্কুরিত হ'ল সেণ্ট পলের এক রাষ্ট্রনৈতিক সিদ্ধান্তে যে রাষ্ট্র অপৌরষেয়। কৃতজ্ঞতার উৎসমুখে সাধু পল রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ঐশ্বরিক মতবাদ আমদানী ক'রেছিলেন সত্য, কিন্তু এই মতবাদকে বেশীদূর অগ্রসর হ'তে দেননি—অর্থাৎ রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য আছে তা পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ ক'রেছিলেন: রোমান নাগরিক হ'তে পারা গর্বের বিষয়, রোমক সাম্রাজ্যের শক্তির পদে প্রণতি জ্ঞাপন অবশ্য কর্তব্য একথা সাধু পল জানিয়েছিলেন বারবার; এও কিন্তু পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়েছিলেন যে সাম্রাজ্যের শক্তি সিভিল অথরিটি ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না—টেম্পোরাল যা কিছুর সঙ্গেই তার সংশ্রব। ধর্ম বা চার্চ কোন লৌকিক শক্তির সীমানার বাইরে, সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে সেদিকে হাত বাড়ান মহাপাপ। সাধু পলের এই সুরে সুর মিলিয়ে রোমের রাজশক্তি ঐক্যতানের সৃষ্টির পথে সহায়তা ক'রলে।

রোমক সাম্রাজ্য ও খৃষ্টধর্মের মধ্যে এ সুরসঙ্গতি কিন্তু বেশীদিন বজায় রইল না। চার্চ আস্তে আস্তে রোমক সাম্রাজ্যের ছায়া থেকে সরতে লাগল সরে। সরে যেতে যেতে এমন স্থানে গিয়ে উপস্থিত হ'ল যেখান থেকে বিদ্বেষের বারনাকুলার ব্যতিরেকে পরস্পরকে আর দেখা যায় না। রোমও এই শিশু প্রতিষ্ঠানের রক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষণের ভার সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি থেকে রোমক রাজশক্তি খৃষ্টধর্মের প্রতি রীতিমত সহিংস অভিযান সুরু ক'রলে; রোম থেকে সাইন ওফ্ দি ক্রস্ মুছে ফেলবার জন্য রোমান সম্রাটরা হ'লেন কৃতসংকল্প। কিন্তু ও দাগ কি মোছে? ও দাগ যে আছে মানুষের মনের কোন এক গভীর কন্দরে, বাইরে চুণকাম ক'রে তাকে কি লোপ করা যায়? অত্যাচারের ঝড়ের শব্দ পেরিয়েও খৃষ্ট-ভক্তের কণ্ঠ শোনা যায়,

'প্রতিবেশীকে ভালবাস তুমি নিজেরই মত'। রোমান নাগরিক অবাক হয়, রোমান রাজপুরুষ অবাক হয়,—এও কি সম্ভব ?

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের দ্বিতীয় দশকে সম্রাট কনস্‌ট্যান্‌টাইন্ যখন দেখলেন যে পীড়নের দ্বারা এই নববিশ্বাসকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব তখন তিনি খৃষ্টধর্মকে রোমের অন্যতম আইন-সঙ্গত ধর্ম ব'লে স্বীকার করে নিলেন। এই যে রাজস্বীকৃতি বা রাষ্ট্রস্বীকৃতি এ হ'য়ে উঠল খৃষ্টধর্ম্মের পক্ষে কাল কারণ এরই ফলে খৃষ্টধর্ম্ম পরিণত হ'ল রাষ্ট্রের দপ্তরে এবং যাজকসম্প্রদায় রূপান্তরিত হ'লেন সরকারী কর্ম্মচারীতে। এই ভাবে চার্চ প্যাগানাইজ্‌ড হওয়ার ফলে ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের দূরত্ব লুপ্ত হয়ে গিয়ে তারা মেলাল পরস্পর হাত।

প্যাগানাইজ্‌ড চার্চের সঙ্গে ক্ষমতালিপ্সু রোমক সাম্রাজ্যের এই যে সন্ধি এর মূলে সৌহার্দের অভাব ছিল যথেষ্ট। তাই চার্চ ফাদাররা সুযোগ পেলেই রাষ্ট্রশক্তির কবল থেকে মুক্ত হ'তে প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। ফাদারদের মধ্যে কেউ কেউ সম্রাটকে জানাতেন নম্রভাবে: হে রোমক সম্রাট! পারত্রিক যা কিছু তা ত' তোমার অধীনে থাকতে পারেনা—তুমি যে শুধু ঐহিক সম্পদের অধিকারী; যাজক সম্প্রদায়কে তোমার পক্ষে বশে আসবার চেষ্টা শুধু অসঙ্গত নয়, চরম অন্যায়ও বটে।

সম্প্রদায়ের কেউ কেউ আবার রোমের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে ভয় পেলেন এবং সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়া অবশ্যম্ভাবী বলে মনে ক'রলেন। গ্রীক্ ক্রিসেন্‌ডম বা কনস্‌ট্যান্‌টিনোপলের খৃষ্টীয় সমাজ হ'ল এই দ্বিতীয় শ্রেণীর। তারা শক্তের ভক্ত হ'য়ে সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করে প্রতিক্রিয়াশীল নিশ্চলতার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জন করে স্থিরভাবে রইলেন। অপরদিকে প্রথম দল, রোমের বিশপের অধীনে ল্যাটিন ক্রিস্‌নেডম্ বলে উঠল, আমি ভয় করবনা, ভয় করবনা। এর ফলে

পরবর্তী হাজার বছর ধ'রে সার্বভৌমিকতার সঙ্গে স্বতন্ত্র খৃষ্টসম্প্রদায়ের সম্বন্ধ নির্ণয় নিয়ে পশ্চিম য়ুরোপ হয়ে উঠল মূল রাষ্ট্রনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্র।

এই বিতর্ক-সভার উদ্বোধনের ভার গ্রহণ করেন উত্তর আফ্রিকার হিপ্পোর কৃষ্ণকায় যাজক সাধু অগাস্টিন।

'বর্বরদের' হাতে রোমের পতনের পর সেণ্ট অগাস্টিন তাঁর জ্ঞাননেত্র খুলে রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের সাক্ষাৎ লাভের চেষ্টা ক'রেছিলেন। এই সময়েই খৃষ্টধর্মে অবিশ্বাসীরা প্রমাণ করবার চেষ্টায় ছিলেন যে রোমের পতনের কারণ খৃষ্টধর্মকে আলিঙ্গন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। অগাস্টিন ব'ললেন তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। জেনিসিস্ জানতে হ'লে প্যাগান ভাইসের দিকে তাকাও। পৌত্তলিকতার অঙ্গাঙ্গিভূত পাপসমূহের মধ্যেই সন্ধান মিলবে রোমের পতনের বীজের। এতদিন অন্ধ ছিলে; এবার আমার কথামত চোখ খোল, মুখ তোল—দেখতে পাবে, বুঝতেও পারবে। আগাস্টিন তাঁর দর্শনের দিগ্‌বলয়ের মধ্যে রোমক সম্রাটকে স্থান দিয়েছিলেন এবং মেনে নিয়েছিলেন যে সম্রাটের প্রভুত্ব পরম প্রভুর নিকট থেকেই পাওয়া; কিন্তু কোন অসতর্ক মুহূর্তেও তাঁকে গির্জার ধারে কাছেও ঘেঁসতে দেননি। পারত্রিক কোন ব্যাপারে যে ইহলৌকিক প্রভু হস্তক্ষেপ ক'রতে পারেন এ স্বীকৃতি অগাস্টিনের রাষ্ট্রদর্শন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুজলেও পাওয়া যাবেনা। রাজার হস্ত পবিত্র ইক্লেসিয়ার বাইরের অঙ্গনই পরিষ্কার করুক—এই ছিল তাঁর দৃঢ়মত। জীবন-দেবতার নগরী আর এই মাটীর পৃথিবীর নগরী এই দুইএর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। কোন রামভক্তের সাধ্য নেই যে এই ব্যবধান অতিক্রম করে। ইহজগতের সমস্ত নগরীই একদিন যাবে রোমের মত ধূলিধূসরিত হয়ে কিন্তু সিভিটাস্ ডেই থাকবে যুগযুগান্ত ধরে কারণ একমাত্র সেই শাশ্বত ও অপৌরষেয়।

চার্চের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে ঐ সিভিটাস্ ডেই বা শাশ্বত নগরী এবং চার্চের শাসন চলে পরমপুরুষের অমোঘ আইনের নিয়ন্ত্রণে। ইহ জগতের সমস্ত নগরী করুক চার্চকে অনুসরণ ও অনুকরণ তা হ'লে তাদের আর পতনের ভয় থাকবে না।

আর্থলি সিটি বা ইহলৌকিক সমস্ত নগরীতে সন্ধান তুমি পাবে দুষ্ট সমাজ ব্যবস্থার। যেখানে আছে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি, আছে ক্রীতদাস প্রথা, আছে শাসক ও শাসিতের পার্থক্য। এই অন্যায়গুলো অবশ্যম্ভাবী কারণ এগুলো মানুষেরই পাপের ফল যে পাপের সৃষ্টি হ'য়েছে স্বর্গ থেকে পতনের ফলে। স্বর্গের স্বাভাবিক সুষমা, স্বাভাবিক শৃঙ্খলা আবার ফিরে আসবে, এই মাটীর পৃথিবীর নগরীই আবার পরিণত হবে স্বর্গোদ্যানে যদি মানুষ চলে ইক্লেসিয়ার অনুশাসন মেনে।

ডক্‌ট্রিন ওফ্ ফল বা পতনবাদের সাহায্য সাধু অগাস্টিন্ সমাজের সমস্ত প্রচলিত ব্যবস্থার কারণ নির্দেশ ক'রেছেন—সপক্ষে ওকালতি ক'রেছেনও বলা চলে; সকল সময় কিন্তু সম্মুখে উপস্থাপিত রেখেছেন সিভিটাস ডেইএর অত্যুদার আদর্শ ও মহান রূপ।

মধ্যযুগ

মধ্যযুগ

মধ্যযুগের যবনিকা উদ্‌ঘাটনের পর সূত্রধার প্রস্তাবনায় জানিয়ে দিয়ে গেলেন যে রোমক সাম্রাজ্যের সূর্য এখন আলোকিত ক'রছে পশ্চিমাঞ্চল ; অপরদিকে রোমের পোপের আধিপত্য হ'য়েছে সুদূর প্রসারী। খৃষ্টধর্মের শান্ত, সুশীতল আবহাওয়ায় এসে বর্বরদের মস্তিষ্ক হ'য়েছে শীতল। পোপ স্বীকার ক'রেছেন যে রোমক সম্রাট তাঁর ইহলৌকিক প্রভু; সম্রাট ব'লেছেন যে পোপ তাঁর আসমুদ্র-আল্পসচল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান ধর্মযাজক। সম্রাট ও পোপ হাত মিলিয়েছেন।

পরস্পর হস্তধারণপূর্বক প্রায় চার শতক পথ চলার পর খৃষ্টীয় আট শতকের শেষভাগে পোপ তৃতীয় লীওর ঐকান্তিক ইচ্ছা হ'ল হস্ত মুক্ত করবার এবং এর জন্য তিনি ক'রলেন প্রাণপণ চেষ্টা, ফলে…'বিদ্বেষ উঠিল গর্জি দয়াধর্মহীন।' এই বিদ্বেষের ইতিহাসের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে মধ্যযুগের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা।

মাঝে মাঝে ক্ষণস্থায়ী সন্ধি স্থাপিত হ'লেও সেই সকল সন্ধিপত্র পুরোণো অকেজো দলিলের মত সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হ'য়েছে রাজশক্তি বা যাজকশক্তির দ্বারা—যখন যার উপকারের প্রয়োজন হ'য়েছে তারই দ্বারা। পোপ শক্তিশালী হ'লে দুর্বল সম্রাটকে ক'রেছেন পদাবনত আবার শক্তিশালী সম্রাট যখন সিংহাসনে আরূঢ় তখন দুর্বল পোপকে করিয়েছেন তাঁর আনুগত্য স্বীকার।

সমস্ত মধ্যযুগ ধ'রে এই রকম ভাবে দুর্বল শক্তি সবলের কাছে নতি স্বীকার ক'রে কেবল নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবার প্রয়াস পাবারই ফলে নূতন রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ সৃষ্টির জন্য জমি পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। সবল শক্তি এক তরফা লাঙল চালিয়ে, নিজের মনোমত ফসল বুনে, ফসল

কেটে ঘরে তুলেছেন। এবং তার থেকে দয়া ক'রে একাংশ ছেড়ে দিয়েছেন নতিস্বীকারের মূল্য স্বরূপ। এক শান্ত আবহাওয়া বিরাজ করেছে এ হেন অবস্থায় যদিও মাঝে মাঝে ভেসে এসেছে ক্ষীণ অনুযোগের সুরে প্রার্থনা : ঈশ্বর তুমিই এর বিচার ক'রো!

আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘ'টে য়ুরোপের রাষ্ট্রনৈতিক গগন বিপত্তির মেঘে ভারাক্রান্ত হয়েছে তখনই যখন একই সঙ্গে কোন শক্তিশালী সম্রাট ও শক্তিমান পোপ করেছেন যথাক্রমে রাজশক্তির ও যাজক-শক্তির আসন দুটি অলঙ্কৃত। এই ধরণের ঘটনা যখনই ঘটেছে তখনই সমগ্র ক্রিসেন্‌ডমের আদালত হয়ে উঠেছে সরগরম। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবহারাজীবেরা প্রচার করছেন নিজ নিজ মতবাদ এবং মতবাদের সপক্ষে যুক্তিতর্কের যতকিছু দুধ ও জল সবই নিঃশংসয়ে এনে জড়ো করেছেন। সমগ্র মধ্যযুগের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা এই সার ও অসারতার দ্বারা ভারাক্রান্ত। অনুসন্ধিৎসুকে হংসের মত নীরং ত্যক্ত্বা ক্ষীরং গ্রহণ করতে হ'লে অনেক পরিশ্রম ক'রতে হয়। পরিশ্রমের পর দেখা যায় যে তিনটি মতবাদ উপস্থাপিত হয়েছে বিচারালয়ে : প্রথম মতবাদ—সর্ব্ববিষয়ে সম্রাট পোপের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; দ্বিতীয় মতবাদ,—সম্রাট ও পোপ হ'লেন সমপদস্থ ও স্ব স্ব এলাকার প্রধান শক্তি; তৃতীয় মতবাদ—পোপ সম্রাট অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সম্রাটের ক্ষমতা পোপের প্রভুত্বেরই অংশমাত্র এবং তাঁর থেকেই পাওয়া। সুতরাং পোপের সঙ্গে সম্রাটের সম্বন্ধ হ'ল সূর্য্যের সঙ্গে চন্দ্রের সম্বন্ধের ন্যায়ই। সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র যেমন সূর্য্য তেমনি সমগ্র খৃষ্টীয় সমাজ বা ক্রিসেন্‌ডমের প্রভু হ'লেন একমাত্র পোপ—সম্রাট নন।

সম্রাটের পক্ষে যে সকল রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবহারাজীবেরা ব্রীফ্ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মহাকবি দান্তে ও পেডুয়ার মারসিগলিওই হ'লেন উজ্জ্বলতম। যাঁরা সমান্তরালবাদ বা প্যারালালিজম্ অর্থাৎ

সম্রাট ও পোপ উভয়েই সমান এই মতবাদ প্রচার ক'রেছিলেন তাঁদের মধ্যে পোপ গেলেসিয়াসই হ'লেন প্রধানতম। রাজশক্তি যাতে কোন রকমে বেঁকে যাজকশক্তির ঘাড়ে এসে না পড়ে তার জন্য তিনি সমান্তরাল সিদ্ধান্তকে সিদ্ধহস্তে খাড়া করবার চেষ্টা করেছেন। যাজক শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা চেষ্টা যাঁরা ক'রেছিলেন তাঁদের মধ্যে সেলিজ-বেরির জন ও সাধু এ্যাকুইন্যাসের নামই সমধিক প্রসিদ্ধ।

মধ্যযুগের
রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাবীরগণ

সাধু এ্যাকুইন্যাস্।

অগাস্টিন থেকে এ্যাকুইন্যাস্ অনেক পথ। এই পথ অতিক্রম ক'রতে গিয়ে যে সময় অতিবাহিত হ'ল তার মধ্যে ঘটেছে অনেক পরিবর্তন। একদা রাজশক্তি দ্বারা আক্রান্ত প্রাণরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত চার্চ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে প্রবল পরাক্রান্ত। অপর দিকে সাম্প্রতিক সমস্যাগুলির গায়ে লেগেছে উদার নীতির পালিশ এবং ফিউডাল প্রথার খিলানে খিলানে ব'সেছে স্থায়ী নীতির লৌহদণ্ড। এহেন পরিবেশে এ্যাকুইনাস্ লিখেছেন তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন যে দর্শনকে বলা হয় মধ্যযুগের এন্সাইক্লোপিডিয়া।

এ্যারিষ্টটল ও অগাস্টিনের সিদ্ধান্তের সমন্বয়ে এ্যাকুইনাস্ দেখিয়েছেন অদৃষ্টপূর্ব নিপুণতা। এ্যারিষ্টটলের চিন্তাধারার বন্যপ্রবাহের মাঝে সিভিটাস্ ডেইয়ের তরীতে পাল তুলে এ্যাকুইনাস যাত্রা করেছেন—নিরুদ্দেশের পানে নয়, লক্ষ্যাভিমুখে। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই যে রাষ্ট্র ও সমাজ-সৃষ্টির সূত্রপাতের সন্ধান পাওয়া যাবে এ্যারিষ্টটলের এই মতবাদের সঙ্গে অগাস্টিনের সিদ্ধান্তের—যে সমগ্র ক্ষমতা উৎস হলেন ঈশ্বর—মিলন সাধন করেছেন প্রজাপতির অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য বলে। এই ধরণের সিভিল অথবা ক্রিমিন্যাল ম্যারেজ ঐ ধরণের সফলতার সঙ্গে এ্যাকুইনাসের আগে বা পরে কেউ সমাধা ক'রতে পারেন নি।

রাজতন্ত্রের সপক্ষে তিনি, কিন্তু রাজার অসীম ক্ষমতার ঘোরতর বিরোধী। রাজশক্তি হবে সীমাবদ্ধ; লিমিটেড্ মনার্কিই হ'ল তাঁর আদর্শ। এই সীমাবদ্ধ শক্তির মধ্যেই সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে জনতার সার্বভৌমিকতার বা পপুলার সভ্রেনটির। রাজশক্তির গতি জনশক্তির ট্রাফিক পুলিশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া ছাড়াও যাজকশক্তির আওতায়

সব সময় তাকে চলাফেরা ক'রতে কারণ পোপ হ'লেন সবার উপরে—তাঁহার উপরে নাই।

এ্যাকুইয়াসের আর্থিক দর্শন এ্যারিষ্টটলের অর্থ-বিদ্যার সমালোচনা হ'লেও মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। তাঁর হাতে ধন সংক্রান্ত কোন বিজ্ঞান বা বিদ্যাই নীতিবাদের প্রভাবমুক্ত হতে পারে না। নীতির-রং চড়ানতে তাঁর আর্থিক দর্শন হ'য়ে উঠেছে অর্থনীতি, সমস্যাগুলো ধারণ করেছে আধুনিক রূপ এবং এসে প'ড়েছে নৈতিক সাম্যবাদের সীমানার মধ্যে।

ত্রয়োদশ শতকের এই যাজক চিন্তাবীরের অর্থ-নৈতিক সিদ্ধান্ত নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করে যে তিনি ভালভাবেই বুঝতেন যে সমাজের মধ্যে নীতিবাদের স্থান কোথায় বা কতটুকু হওয়া উচিত—যা আমরা আজ বিশ শতকেও বুঝিনা।

সেলিজবেরির জন।

সেলিজবেরির জন ছিলেন ইংলণ্ডের অধিবাসী। রাষ্ট্রের সঙ্গে জীবদেহের তুলনা করার পর তিনি গেয়েছেন পোপের ঝাণ্ডা উচ্চ রাখার সঙ্গীত। তিনি গাইলেন, শাশ্বত নিয়ম একটা আছে যে নিয়ম মানুষের গড়া আইনের মত পরিবর্তনশীল নয়, তার অনেক উর্দ্ধে। এ জগতের নরপতিরা নরের উপর পতিত্ব করতে পারেন কিন্তু এই নিয়মের উপর পতিত্ব করতে পারেন না বরং এক মহান কর্তব্যের মত এর কাছে নতি স্বীকার ক'রতে বাধ্য। এই যে ল' ইটারন্যাল এর সংরক্ষক হ'ল চার্চ এবং তত্ত্বাবধারক হ'লেন মহাযাজক পোপ। সুতরাং নরপতিদের পোপের সুপারিনটেনডেন্স মানতে হবে।

দান্তে।

মহাকবি দান্তে ইতালীয় জীবনের এক যুগসন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন। কাব্যপ্রতিভা ছাড়া পাণ্ডিত্যেও তিনি ছিলেন মহান। মধ্যযুগে পণ্ডিত বলতে যা বোঝা যায় দান্তে ছিলেন তাঁদের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ডিভানিয়া কমিডিয়া ছাড়াও তিনি আমাদের 'ডি মনার্কিয়া' দিয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পাতার উপর যে ছাপ এঁকে দিয়েছেন তা কখনও মুছবে না।

যাঁরা তাঁর জীবনালেখ্য রচনা ক'রেছেন তাঁদের অনেকের মতে তিনি হ'লেন একজন মিস্টিক; এক নির্জা স্বপ্নবিলাসী কিন্তু আসলে তিনি তা নন। তাঁর প্রকৃত রূপে তাঁকে অঙ্কিত ক'রতে হবে এক কূটনীতিজ্ঞ হিসাবে, যোদ্ধা হিসাবে, আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সতত সংগ্রামশীল হিসাবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যদি সারথি হিসাবেই অঙ্কিত করা হয়, বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বরাগকে যদি অবৈধ প্রণয়ের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়, স্যর ওয়ালটার র‍্যালিকে যদি কেবল গোল-আলুর প্রচলনের জন্যই স্মরণ করা হয় তবে যে রকম ভুল হবে, দান্তেকে কেবল ড্রীমার ব'লে মনে ক'রলে সেইরকমই ভুল হবে।

দ্রষ্টার মত জ্ঞাননেত্রে তিনি এক বিশ্বজনীন সাম্রাজ্যের রূপ দেখেছিলেন এবং তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব ক'রেছিলেন হৃদয়ের নিভৃততম কন্দরে। সার্থক স্বচ্ছতার সঙ্গে তিনি বুঝেছিলেন যে যতদিন না সর্ব রাজ্যের উপরিস্থ এক সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়, সর্বজাতির উপর এক প্রকৃত সার্বভৌমিকতার প্রতিষ্ঠা হয় ততদিন শান্তির আশা স্বপ্নলোকেই বিরাজ ক'রবে। এই জন্যই তাঁকে বলা হয় শান্তিকামী চেতনশীল রাষ্ট্রনৈতিক দার্শনিকদের পথ প্রদর্শক।

পোপ-সমর্থক ফ্লোরেন্সের এক প্রাচীন পরিবারে তাঁর জন্ম। কর্মে কিন্তু তিনি দাঁড়ান পোপের ঘোরতর বিরুদ্ধে। জন্মের সঙ্গে কর্মের এই অসামঞ্জস্যের কারণানুসন্ধানে আমাদের বেশীদূর যেতে হয় না। দান্তের সময়ে গ্রীক সিটিষ্টেটের অরাজকতার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল ইতালীতে। এই অরাজকতার কবল থেকে ফ্লোরেন্সও রক্ষা পায়নি। বিভিন্ন নগরী-রাষ্ট্রের টাইর‍্যাণ্টদের মধ্যে কূট ষড়যন্ত্র ইতালীর রাষ্ট্রনৈতিক আবহাওয়া সম্পূর্ণ বিষিয়ে তুলেছিল। এই ষড়যন্ত্রে বিশেষভাবে হাত অংশ গ্রহণ করেন মহামতি পোপ। মহামতির আশা ছিল যে পোপ বা প্রধান যাজকের সম্পত্তির সীমাবৃদ্ধি ও তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রবেন বিভিন্ন টাইর‍্যাণ্টদের মস্তকে হস্ত বুলানর দ্বারা।

পিতৃভূমির এই দুর্দশা মহাকবি চোখের সামনে দেখতে পারলেন না। কি ক'রে এই বিরামবিহীন চক্রান্ত ও আত্মকলহকে সমাপ্তির পথে আনা যায় তাই চিন্তা ক'রতে লাগলেন। অবশেষে তিনি লাক্সেমবার্গের নরপতি সপ্তম হেনরীকে গোপনে আমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন ইতালীয় সমস্ত হীন চক্রান্তের পরিসমাপ্তি ঘটাবার এবং পোপের ফ্লোরেন্স করতলগত করার আশা ধূলিস্মাৎ করবার জন্য। আহুত হেনরী সদলবলে এসে প'ড়লেন; মস্তক বাঁচাবার জন্য দান্তে গেলেন অজ্ঞাতবাসে। অজ্ঞাতবাসে ব'সে তিনি হেনরীর প্রতিটি সফলতার সংবাদ উল্লাসের সঙ্গে সংগ্রহ ক'রতেন। এই উল্লাস কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হ'লনা কারণ হঠাৎ হেনরীর মৃত্যু হওয়াতে দান্তের স্বপ্ন ছায়ার মত গেল মিলিয়ে। এই অজ্ঞাতবাসেই তাঁর 'ডি মনাকিয়ার' সৃষ্টি।

দান্তের দর্শনকে অনেকে ব'সেছেন সাম্রাজ্যবাদের পাকা বুনিয়াদ। তাঁরা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন। শোষণ ও শাসনের উদ্দেশ্যে দান্তে কখনও সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা ক'রেননি। তাঁর সাম্রাজ্যবাদ (যদি একান্তই সাম্রাজ্যবাদ নাম দিতে হয়) সর্বদেশের, সর্বকালের রাষ্ট্রনীতির

দূষিত আবহাওয়া দূর করবার জন্য। তাঁর সাম্রাজ্যবাদ কাণ্টের সাম্রাজ্য-বাদের কাছাকাছি গিয়ে প'ড়েছে।

যে অবস্থার সম্মুখীন হ'য়ে মহাকবি দান্তে নূতন সাম্রাজ্যবাদের দর্শন পৃথিবীকে দিয়ে গেছেন সেইরকম অবস্থারই সম্মুখীন হ'য়ে ছিলেন প্রায় দু'শো বছর পরে আর একজন ফ্লোরেন্সের অধিবাসী। তিনি হ'লেন নিকোলো মেকিয়াভেলি—যাঁর থেকে শুরু হ'য়েছে সাম্প্রতিক যুগ।

সাম্প্রতিক যুগের কথায় আসব আমরা পরে।

সমাপ্ত